ইউনিট ৪

ভূমির বন্ধুরতা প্রদর্শন

বর্তুলাকার পৃথিবীর উপরিভাগ সর্বত্র সমতল নয়। এর কোথাও সুউচ্চ পর্বত, কোথাও মালভূমি, কোথাও সমভূমি আবার কোথাও গভীর খাত, নদী, হ্রদ, সাগর, উপসাগর প্রভৃতি অবস্থিত। ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থ এরূপ উঁচু ও নিচু স্থানগুলোর সামগ্রিক রূপকে ভূমি বন্ধুরতা বলা হয়। যে মানচিত্রে ভূমির এই উঁচু-নীচু অবস্থা বা ভূমি বন্ধুরতাকে দেখানো হয় তাকে ভূমি বন্ধুরতার মানচিত্র বলে। সমতল কাগজের মানচিত্রে এই ধরনের উঁচু নিচু ভূমিরূপ প্রদর্শনের জন্য বিশেষ অংকন পদ্ধতি অনুসরন করা হয়। এই ইউনিটে আপনারা ভূমি বন্ধুরতা প্রদর্শনের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং তার প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ হচ্ছে-

পাঠ ৪.১ ঃ ভূমি বন্ধুরতা প্রদর্শনের পদ্ধতি
পাঠ ৪.২ ঃ সমোন্নতি রেখা ও পার্শ্বচিত্র
পাঠ ৪.৩ ঃ কতিপয় বিশেষ ভূমিরূপের পার্শ্বচিত্র
পাঠ ৪.৪ ঃ ঢাল ও নতিমাত্রা

পাঠ-৪.১ ভূমি বন্ধুরতা প্রদর্শনের পদ্ধতি

এই পাঠ শেষে আপনি-

- **উচ্চতা, ভূমি বন্ধুরতা ও বন্ধুরতা মানচিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং**
- **মানচিত্রে ভূমি বন্ধুরতা প্রদর্শনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।**

উচ্চতা, ভূমিবন্ধুরতা এবং ভূমিবন্ধুরতা মানচিত্র

উচ্চতা (Elevation)ঃ সাধারণত কোন আদর্শ সমতল হতে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের উন্নতিকে উচ্চতা বলে। পৃথিবীর উপরিভাগের অধিকাংশ দখল করে আছে পানি এবং এই পানির সাধারণ ধর্ম হচ্ছে পৃষ্ঠদেশের সমতা রক্ষা করা। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতাকে আদর্শ উচ্চতা ধরে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা পরিমাপ করা হয়। এ হিসাবে সমুদ্রের উপরিভাগের পানি সমতলের উন্নতির মান শূন্য (০) ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ভূমির উন্নতি ফুট, মিটার বা অন্য কোন একক প্রকাশ করা হয়। সমুদ্র সমতলের (Sea level) চেয়ে নিচু উচ্চতাকে ঋণাত্মক (Negative) এলাকা বলে। এরূপ ভূভাগের অবনতি প্রকাশ করার জন্য এর উচ্চতা উলে-খের পূর্বে বিয়োগ চিহ্ন (-) ব্যবহার করা হয় (যেমন ২০ ফুট বা ৩০ মিটার)। সমুদ্র সমতলের চেয়ে উঁচু ধনাত্মক (Positive) এলাকার উচ্চতা উলে-খের পূর্বে সাধারণত কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না (চিহ্ন উলে-খ না করলে তাকে ধনাত্মক বলে ধরে নেয়া হয়)। এক্ষেত্রে সরাসরি ধনাত্মক দৈর্ঘ্য পরিমাপক একক (যেমন ২০ ফুট বা ৩০ মিটার) ব্যবহার করা হয়।

ভূমি বন্ধুরতা (Relief)ঃ সমুদ্র পৃষ্ঠের মত ভূ-পৃষ্ঠ সর্বত্র সমতল নয়। এখানে কোথাও পর্বতমালা, কোথাও মালভূমি, কোথাও বা গভীর হ্রদ। পাশাপাশি রয়েছে উপত্যকা, নদী প্রণালী, জলপ্রপাত, খাঁড়ি প্রভৃতি বিশেষ ভূদৃশ্য। এ ধরনের ভূমিরূপ সমুদ্র সমতল হতে কখনো ধীরে উচ্চতাপ্রাপ্ত হয়েছে, আবার কখনো আকস্মিক উচ্চতা লাভ করেছে। কোন ভূদৃশ্যে উচ্চতার তারতম্য কোথাও কম কোথাও বা বেশি। ভূ-পৃষ্ঠের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় ভূমি বন্ধুরতা। ভূমি বন্ধুরতা প্রাকৃতিক ভূগোলের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য বিষয়।

ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র (Relief Map)ঃ সমতল কাগজের উপর বিভিন্ন দেশের সীমারেখা, নদ-নদী, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ পানির এলাকা অঙ্কন করে দেখান সহজ। কিন্তু স্থলভাগের কোন স্থান উঁচু, কোন স্থান নিচু তা নির্দেশ করা কঠিন। অনেক সময় ছোট বড় তক্তার উপর পুটিং, কাগজের মন্ড, মোম, প-াষ্টার অব প্যারিস প্রভৃতির দ্বারা দেশের স্থান বিশেষের উচ্চতা বা গভীরতা দেখান হয়; এগুলোকে *ভূ-প্রকৃতির মডেল Times New Roman/(Relief Model)* বলে। মডেলে আনুভূমিক স্কেলের চেয়ে উলম্ব স্কেল যথেষ্ট বর্ধিত আকারে দেখান হয়। কিন্তু সমতল কাগজের উপর অঙ্কিত মানচিত্রে এরূপ ভূমি বন্ধুরতা দেখান যায় না। এজন্য বিশেষ কৌশল ও অংকন পদ্ধতি অবলম্বন করে সমতল কাগজের উপর ভূমি বন্ধুরতা প্রদর্শন করা হলে তাকে ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র (Relief Map) বলা হয়।

বৃহৎ স্কেল মানচিত্র অংকনে ভূমিবন্ধুরতা মানচিত্রের অনেক কৌশল অনুসরন করা হয়। সাধারণত ক্ষুদ্র স্কেল বিশিষ্ট মানচিত্রে বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপগুলোকে অস্বীকার করে এদের অবস্থান ও আয়তন সঠিকভাবে দেখান হয়, কিন্তু এদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যগুলো সঠিকভাবে দেখান হয় না। অন্যদিকে, বৃহৎ স্কেল বিশিষ্ট মানচিত্রে বিভিন্ন ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য ও অবস্থান উভয়ই গুরুত্ব পায়। এরূপ মানচিত্রে অবস্থান ও আয়তন দেখাবার সাথে সাথে বিদ্যমান ভূমির ঢালগুলো দেখিয়ে ভূমিরূপকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়। তাছাড়া, বৃহৎ স্কেল বিশিষ্ট মানচিত্রে স্থান বিশেষের প্রকৃত উচ্চতাও সঠিকভাবে দেখান হয়।

ভূমি বন্ধুরতা প্রদর্শনের পদ্ধতি

সমতল কাগজের উপর অংকিত মানচিত্রে ভূমি বন্ধুরতা দেখানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরন করা হয়। ভূমি বন্ধুরতা দেখাবার বিভিন্ন পদ্ধতিগুলোকে **(১) সচিত্র পদ্ধতি (২) গাণিতিক পদ্ধতি (৩) উক্ত দুইটি পদ্ধতির সমন্বয়** নামক তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। নিচে পদ্ধতিগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হল ঃ

(১) সচিত্র পদ্ধতি (Prictorial Methods)

এই শ্রেণীর অংকন পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে ভূমিরূপের কম-বেশি কাছাকাছি একটি চাক্ষুষ চিত্র অংকন করা হয়।

(ক) ভ্রুলেখা (Hachures)ঃ ভ্রুলেখা হচ্ছে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম রেখার সমষ্টি, এ রেখাগুলোকে পাহাড় বা পর্বতের ঢালের দিকে উপর থেকে নিচে টেনে সে স্থানের ভূমি বন্ধুরতা দেখান হয়। মানুষের চোখের ভ্রুর মত দেখতে বিধায় এদেরকে ভ্রুলেখা বলে।

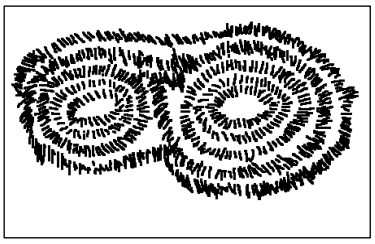

চিত্র ৪.১.১ ভ্রুলেখা

পদ্ধতি ঃ পানি প্রবাহের ঢাল অনুযায়ী ভ্রুলেখা বিন্যস্ত থাকে। যে স্থান যত বেশি উঁচু সেখানে ভ্রুলেখাগুলো তত বেশি ঘন অর্থাৎ গাঢ় ছায়াপাত এবং কম উঁচু স্থানে যেখানে ঢাল কম সেখানে রেখাগুলো পাতলা থাকে অর্থাৎ হালকা ছায়াপাত করতে হয়। পাহাড়ের চূড়া বুঝাবার জন্য কেন্দ্রস্থলে কিছু অংশ সাদা রাখা হয়। যে ঢাল খুব খাঁড়া সেখানে ভ্রুলেখার সন্নিবেশনের ফলে স্থনটি কালো আভাযুক্ত হয়ে উঠে এবং ৪৫° এর চেয়ে বেশি উঁচু স্থান একেবারেই কালো দেখায়। সমভূমি বা স্বল্প ঢাল বিশিষ্ট স্থানগুলো সাদা রাখা হয়। ভূমির ঢাল অনুসারে উপর থেকে নিচের দিকে এ রেখাগুলোও ঘন থেকে ক্রমশঃ পাতলা ও হালকা হয় এবং সমতল অঞ্চল রেখাহীন অবস্থায় থাকে। চিত্র ৪.১.১ এ ভ্রুলেখার মাধ্যমে দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট টিলার ভূমিরূপ দেখানো হয়েছে।

সুবিধা ঃ এই পদ্ধতিতে মানচিত্রের আপেক্ষিক ঢালের দিক খুব সুন্দররূপে প্রদর্শিত হওয়ায় ভূমিরূপ সহজে চিনতে পারা যায়। ফলে অজ্ঞ লোকের পক্ষেও বন্ধুরতা বুঝতে কষ্ট হয় না। ঢিবি (Mounds), টিলা (Hillocks), নদী, নদী-সোপান প্রভৃতি স্বল্প উচ্চতা বিশিষ্ট ভূমি ভ্রুলেখা দ্বারা মানচিত্রে সুন্দররূপে প্রদর্শিত হয়।

অসুবিধা ঃ ভ্রুলেখা পদ্ধতিতে সুবিধার চেয়ে অসুবিধার দিকটাই বেশি।
১। এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ঢালের চিত্র সুন্দররূপে ফুটিয়ে তোলা গেলেও ঢালের পরিমান প্রকাশ করা যায় না।
২। এর মাধ্যমে ভূমির প্রকৃত উচ্চতা প্রকাশ করা যায় না।
৩। পার্বত্য এলাকা দেখানোর সময় ঘন রেখার কারনে ভূমিরূপের খুঁটিনাটি বিষয় স্পষ্ট করা যায় না।
৪। ভ্রুলেখা অংকন কাজটি খুব কষ্টকর, সময়সাপেক্ষ এবং ব্যয়বহুল।

ব্যবহার ঃ সাধারণত স্বল্প উচ্চতা বা গভীরতার ভূমিরূপ দেখাতে ভ্রুলেখা ব্যবহৃত হয়। তাই সমতল ভূমি এলাকায় অগভীর উপত্যকা বা ছোট টিলা দেখাতে ভ্রুলেখা ব্যবহার করা হয়।

(খ) ছায়াপাত পদ্ধতি (Shading/Methods)ঃ এই পদ্ধতিতে আলো ও ছায়ার সাহায্যে ভূভাগের বন্ধুরতা নির্দেশ করা হয়। কাল্পনিকভাবে পার্শ্ব দিক বা উলম্ব দিক হতে আলোকপাতের মাধ্যমে আলো ও ছায়ার পরিমান নির্ধারণ করা হয়।

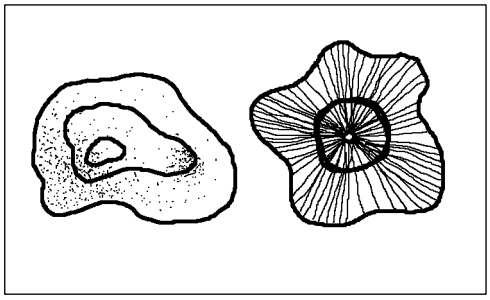

চিত্র ৪.১.২ হালকা ও গাঢ় ছায়াপাত

পদ্ধতি ঃ কোন উঁচু ভূমির এক অংশ একটু বেশি কালো ও অপর অংশ একটু বেশি সাদা (Light and shade) রাখলে এর উচ্চতা সহজে বুঝতে পারা যায়। কোন জায়গা বন্ধুর বা সমতল তা বুঝতে হলে পাহাড়ের লম্ব বা খাঁড়া অংশে কালো রেখা অংকন করা হয়। এতে পাহাড় বা পর্বতটি কোন দিকে প্রলম্বিত হয়েছে তা বুঝতে পারা যায়। অনুরূপভাবে মালভূমি, উপত্যকা, পাহাড়ের সমতল চূড়া প্রভৃতি অংশ বুঝাবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন হালকা বা গাঢ় রেখা অংকন করা হয়। অনেক সময় নিম্নভূমি বুঝাবার জন্য ছোট ছোট পাতলা বিন্দু, উঁচু অংশ বুঝাবার জন্য গাঢ় কালো রেখা প্রভৃতি নানাবিধ ছায়াপাত ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে অংকিত মানচিত্রের পাশে কোন প্রকার ছায়াপাতের দ্বারা কি বুঝাবে তার সারণী দেয়া হয়। কাল্পনিক আলোর উৎস অনুযায়ী ছায়াপাত পদ্ধতি দুই প্রকার।

উলম্ব আলোকপাত (Vertical Illumination/Methods) পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে আলোর উৎসকে ভূপৃষ্ঠের সরাসরি উপর দিক হতে লম্ব অবস্থানে কল্পনা করা হয়। পাহাড়ের চূড়ায় আলোর কল্পনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, যে অংশে ঢাল খুব বেশি সেখানে ছায়া এবং যে অংশ সমতল সেখানে আলো পড়বে। ঢাল যত খাড়াই হবে ছায়াপাত তত গাঢ় হবে।

পাহাড়ের চূড়া, মালভূমি, শৈলশিরার (Ridge) শীর্ষদেশ, উপত্যকাতল প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত সমতল অংশ হালকা ছায়াপাত দ্বারা চিত্রিত করতে হয়।

তির্যক আলোকপাত (Oblique Illumination/Methods) পদ্ধতি ঃ এই পদ্ধতিতে কল্পনা করা হয় যে, মানচিত্রের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আলো আসছে। ফলে এই পদ্ধতিতে অংকিত চিত্রে উঁচু ভূভাগের দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে ছায়া পড়বে এবং উত্তর-পশ্চিম দিক উজ্জ্বল দেখাবে। এরূপ ছায়াপাতের প্রধান অসুবিধা এই যে, এর মাধ্যমে কোন ঢালের আপেক্ষিক উচ্চতা স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। ছায়ার মধ্যস্থিত ঢাল সর্বদা খাঁড়া বা উঁচু বলে মনে হয়। এরূপ ছায়ার মধ্যস্থিত অংশ সমতল হলেও তা উঁচু বলে মনে হবে।

সুবিধাঃ এই পদ্ধতিতে কোন বৃহৎ এলাকার ভূমি বন্ধুরতা সম্পর্কে সহজে ধারণা পাওয়া যায়। এর অংকন প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজ। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে সময় ও আর্থিক খরচ কম হয়।

অসুবিধাঃ ছায়াপাত পদ্ধতি কোন ভূমির উচ্চতা এবং ক্রমোন্নতি সম্পর্কে সম্পূর্ন সঠিক ধারণা দিতে পারে না। এতে বাস্তবের চেয়ে কল্পনার পরিমান বেশি থাকে ফলে ভূল হবার সম্ভাবনাও বেড়ে যায়।

ব্যবহারঃ সাধারণত ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্রে ভূমিরূপ প্রদর্শনে এই পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়।

(গ) স্তরীভূত রং (Layer Tint Methods) পদ্ধতিঃ এই পদ্ধতিতে কোন স্থানের বন্ধুরতা দেখাবার জন্য মানচিত্রে নানা প্রকার রং এর ব্যবহার করা হয়। একটি প্রাকৃতিক ভূমিরূপ মানচিত্রে অনেক ধরনের রং ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এর এক একটি রং একটি করে নির্দিষ্ট উচ্চতা নির্দেশ করে।

পদ্ধতিঃ ভূমিরূপ প্রদর্শনে ব্যবহৃত *আন্তর্জাতিক রং ব্যবহার বিন্যাস* (International Colour Scheme) অনুসরন করে সাধারণত নিম্নভূমি দেখাবার জন্য *সবুজ*, অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি দেখাবার জন্য *হলুদ* এবং বেশি উচ্চতা দেখাবার জন্য *খয়েরী* রং ব্যবহার করা হয়। আবার একই রং হালকা বা গাঢ় করে উচ্চতার ক্রমাবনতি বা ক্রমোন্নতি দেখানো হয়। সমুদ্রের অল্প গভীর অংশ বুঝাবার জন্য খুব *হালকা নীল*, তার চেয়ে একটু গভীর অংশ বুঝাবার জন্য *নীল* এবং খুব বেশি গভীর সমুদ্র নির্দেশ করবার জন্য অত্যন্ত *গাঢ় নীল* রং ব্যবহার করা হয়। তেমনিভাবে, ভূভাগের বেশি সমতল অংশ বুঝাবার জন্য *হালকা সবুজ*, তার চেয়ে একটু বেশি উঁচু অংশ বুঝাবার জন্য *গাঢ় সবুজ* ; মালভূমির বিভিন্ন অংশের অল্প বা অধিক উচ্চতা বুঝাবার জন্য *হালকা হলুদ* থেকে *গাঢ় হলুদ*, *কমলা* এবং *ধূসর* রং; উঁচু পার্বত্য অঞ্চল বুঝাবার জন্য *খয়েরী* রং এবং কখনও কখনও বরফাবৃত অংশ বোঝাবার জন্য *সাদা*, *কালো* বা *গাঢ় খয়েরী* রং ব্যবহার করা হয়। স্থানীয় বৈচিত্রসূচক বা ভূসংস্থানিক মানচিত্রে (Topographical Maps) সাধারণত এ পদ্ধতিতে ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা দেখান হয়। কোন রং কি ধরণের ভূমিরূপ দেখায় তার একটি সারণী সাধারণত মনচিত্রে সন্নিবেশ করা হয়।

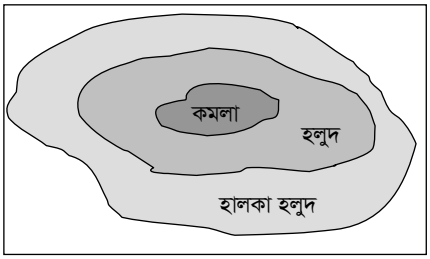

চিত্র ৪.১.৩ স্ড়রীভূত রং

সুবিধাঃ স্তরীভূত রং পদ্ধতিতে সহজেই ভূমির ধরণ ও বন্ধুরতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ভূমিরূপের স্তরগুলো ভিন্ন ভিন্ন রং ব্যবহারের কারণে স্পষ্ট হয়ে উঠে।

অসুবিধাঃ বিভিন্ন ধরনের রং ব্যবহারের কারণে এই মানচিত্র অংকনে বিশেষ পারদর্শীতার প্রয়োজন হয়। তাছাড়াও এতে সময় এবং আর্থিক খরচের পরিমান বেশি।

গাণিতিক পদ্ধতি (Mathematical Methods)

(ক) স্পট হাইট (Spot Heights)ঃ কোন স্থানের প্রকৃত উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ বা সমুদ্র সমতল থেকে জরিপ করে নির্ধারণ করা হয়। ফলে, এ উচ্চতাগুলো কোন ভূভাগের বন্ধুরতা নির্দেশ করে না। মানচিত্রের উপর বিন্দু ও এর পাশে সংখ্যা দ্বারা সমুদ্র সমতল থেকে কোন স্থানের উচ্চতা ফুট বা মিটারে প্রকাশ করা হয়। এ উচ্চতাগুলোর মাধ্যমে কোন স্থান কত উঁচুতে তা সহজে বুঝতে পারা যায়।

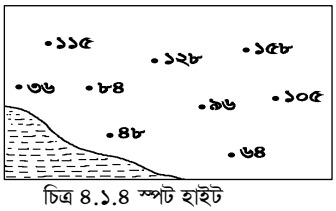

চিত্র ৪.১.৪ স্পট হাইট

(খ) বেঞ্চ মার্ক (Bench Marks)ঃ কোন অট্টালিকা বা কংক্রিটের (Concrete) স্তম্ভের গায়ে সমুদ্র সমতল থেকে ঐ স্থানের উচ্চতা লেখা হলে তাকে বেঞ্চ মার্ক বলে। জরিপের মাধ্যমে বা ব্যারোমিটারের সাহায্যে এরূপ উচ্চতা নির্ণয় করা হয়। মানচিত্রে এগুলো B.M. অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করে এর পাশে সে স্থানের উচ্চতা ফুট বা মিটারে লেখা হয়। স্পষ্ট হাইট থেকে এর পার্থক্য এ যে, এটা সমুদ্র সমতল থেকে ভূমির উচ্চতা নির্দেশ না করে অট্টালিকা বা স্তম্ভের গায়ে অঙ্কিত অংশের উচ্চতা নির্দেশ করে।

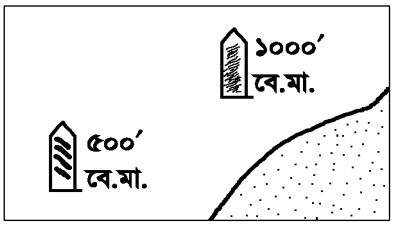

চিত্র ৪.১.৫ বেঞ্চ মার্ক

(গ) ত্রিকোণমিতিক ষ্টেশন (Trigonometrical Stations)ঃ এটি ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থিত বিভিন্ন বিন্দু যা ত্রিভুজীকরণ পদ্ধতির জরিপের ষ্টেশন হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মানচিত্রের উপর এদেরকে ক্ষুদ্র নিরেট (Solid) ত্রিভুজ দ্বারা চিত্রিত করে তার পাশে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা লিখতে হয়। এর প্রধান বিশেষত্ব এই যে, এগুলো সুনির্দিষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকৃত উচ্চতা জ্ঞাপন করে, কিন্তু সমগ্র মানচিত্রের উপর ইতস্তত বিন্যস্ত থাকায়, মানচিত্রে প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে ফুটিয়ে তুলতে অসমর্থ হয়। সুতরাং অন্যান্য পদ্ধতির মিশ্রণ ছাড়া কেবলমাত্র ত্রিকোণমিতিক ষ্টেশনের ব্যবহার সচরাচর করা হয় না।

(ঘ) সমোন্নতি রেখা (Contours) ঃ সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে সমান উচ্চতা বিশিষ্ট স্থানগুলোকে মানচিত্রের উপর যে আকাবাঁকা রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয় সে রেখাকে সমোন্নতি রেখা বলে। মানচিত্রে এরূপ সমোন্নতি রেখার সাহায্যে কোন স্থানের বন্ধুরতা দেখান হয়। সমতল কাগজের উপর অঙ্কিত মানচিত্রে ভূপৃষ্ঠের বন্ধুরতা দেখাবার জন্য এটি সবচেয়ে আধুনিক ও অধিক প্রচলিত পদ্ধতি।

পদ্ধতিঃ কোন এলাকার সমোন্নতি রেখা সম্বলিত মানচিত্র অঙ্কন করতে হলে প্রথমে মানচিত্রের উপরে বিভিন্ন স্থানীয় উচ্চতা চিহ্নিত করতে হয়। অতপর যে সব স্থানের উচ্চতা সমান সেগুলোকে একটি সাবলীল বাঁকা রেখার সাহায্যে যোগ করা হয়। মনে রাখতে হবে যে, এরূপ সমোন্নতি রেখা দ্বারা উচ্চতার সঠিক অবস্থা বুঝায় না, মোটামুটি অবস্থা বুঝাবার জন্য এগুলো ব্যবহার করা হয়। পরস্পর সন্নিহিত দুই সমোন্নতি রেখার মধ্যে নির্দিষ্ট উচ্চতার ব্যবধান থাকে। মানচিত্রের স্কেল ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী এরূপ রেখার ব্যবধানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। দূরে দূরে সন্নিবেশিত রেখা দ্বারা কম ঢালু ও কম বন্ধুর ভূভাগ বুঝায়। অন্যদিকে ঘনসন্নিবেশিত সমোন্নতি রেখার মাধ্যমে অধিক ঢালু ভূমিরূপ বোঝায়। বাংলাদেশ জরিপ বিভাগের মানচিত্রে সাধারণত আনুভূমিক স্কেল ১ ইঞ্চিতে ১ মাইল হলে সমোন্নতি রেখার উলম্ব স্কেল ৫০ ফুট ধরা হয়। অর্থাৎ সমোন্নতি রেখাগুলো ৫০ ফুট ব্যবধানে অংকন করা হয়। আবার যখন অনুভূমিক স্কেল ১ ইঞ্চিতে ৪ মাইল তখন উলম্ব স্কেল ২৫০ ফুট ধরা হয়।

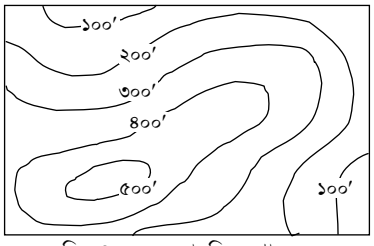

চিত্র ৪.১.৬ সমোন্নতি রেখা

সুবিধাঃ সমোন্নতি রেখা সহজে অংকন করা যায় এবং এগুলো মানচিত্রের অন্যান্য বর্ণনা বা তথ্য প্রকাশে বাধার সৃষ্ঠি করে না। স্বল্প কল্পনা শক্তি এবং অভ্যাসের মাধ্যমে সমোন্নতি রেখার মাধ্যমে যে কোন দেশের ভূমিরূপের চিত্র প্রদর্শন করা সম্ভব। এটা কোন স্থানের উচ্চতা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করে। সমোন্নতি রেখার সাহায্যে কোন স্থানের কোন দিক কতটা ঢালু তা বুঝতে পারা যায় এবং ঢাল নির্ণয় করা যায়। একমাত্র এ পদ্ধতির মাধ্যমেই আপেক্ষিক ঢাল এবং ঢালের প্রকৃত পরিমান ডিগ্রিতে পরিমাপ করা যায়।

অসুবিধাঃ এ পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হচ্ছে যে, সমোন্নতি রেখার ব্যবধানের চেয়ে কম উচ্চতা বিশিষ্ট স্থান সমোন্নতি রেখা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। প্রকৃত জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা নিরূপণ করা হয় বলে সমোন্নতি রেখার মাধ্যমে ভূমির বন্ধুরতা নির্দেশ অত্যন্ত ধীর, মন্থর ও ব্যয়বহুল পদ্ধতি।

(ঙ) ফর্ম লাইন (Form Lines) ঃ এটি সমোন্নতি রেখার প্রায় অনুরূপ একটি পদ্ধতি। সমোন্নতি রেখাগুলো মধ্যস্থলে যে সব স্থানের উচ্চতা যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপন করা সম্ভব হয়নি সেখানে উচ্চতা কিরূপ হতে পারে তা আনুমানিক ভাবে নিরূপন করে ভাঙ্গা রেখা দ্বারা ঐরূপ সমোন্নতি বিশিষ্ট স্থানগুলো যোগ করলে তাকে ফর্ম লাইন বলা হয়। ভাঙ্গা ভাঙ্গা রেখা হিসাবে অঙ্কিত হওয়ায় ঐরূপ রেখাগুলো ও সমোন্নতি রেখাগুলোর মধ্যে পার্থক্য সহজে বুঝতে পারা যায়। ভূপ্রকৃতির বিস্তারিত বর্ণনা দেয়ার জন্য এরূপ রেখা বেশী ব্যবহৃত হয়। বিশেষ

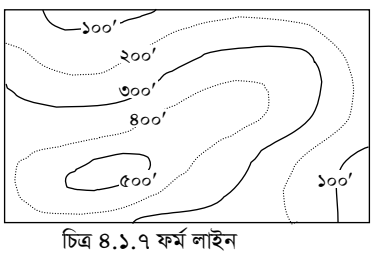

চিত্র ৪.১.৭ ফর্ম লাইন

করে নিমজ্জিত ভূভাগের যে সব স্থানে সমোন্নতি রেখা অংকন করা সম্ভব নয় এবং যে সব স্থানে সমোন্নতি রেখার ব্যবধান বেশি তেমন স্থানের ভূমিরূপের বর্ণনার জন্য ফর্মলাইনের সাহায্য নেয়া হয়।

বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় (Combination of Several Methods)

অধিকাংশ আধুনিক প্রাকৃতিক মানচিত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ে বন্ধুরতা দেখান হয়। নিচে এদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল।

(ক) সমোন্নতি রেখা ও ভ্রুলেখা (Contours and Hachures)ঃ সমোন্নতি রেখাগুলোর মধ্যস্থিত ব্যবধান খুব বেশী হলে অপ্রধান ভূমিরূপ দেখাবার জন্য ভ্রুলেখার সাহায্য নেয়া হয়।

(খ) সমোন্নতি রেখা, ভ্রুলেখা ও স্পট হাইট (Contours, Hachures and Spot Heights)ঃ অনেক সময় সমোন্নতি রেখা ও ভ্রুলেখা দ্বারা অংকিত মানচিত্রে স্পট হাইট যুক্ত করে মানচিত্রের উপযোগীতা বৃদ্ধি করা হয়।

(গ) সমোন্নতি রেখা, ফর্মলাইন ও স্পট হাইট (Contours, Form Lines and Spot Heights)ঃ ভ্রুলেখার পরিবর্তে অনেক সময় সমোন্নতি রেখা ও স্থানীয় উচ্চতার সাথে ফর্মলাইন ব্যবহার করা হয়। দেখতে পূর্ববর্তী মানচিত্রেগুলোর মত সুন্দর না হলেও বনভূমির মত অঞ্চলে, যে স্থানের ভূপ্রকৃতির ব্যাপক রূপ বর্ণনায় ভ্রুলেখা সমর্থ নয় সেখানে ফর্মলাইন ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) সমোন্নতি রেখা ও ছায়াপাত (Contours and Hill Shading)ঃ সমোন্নতি রেখা ও ভ্রুলেখার সাহায্যে যেভাবে ভূমিরূপ দেখানো হয় প্রায় একইভাবে সমোন্নতি রেখা ও ছায়াপাতের সাহায্যে ভূমিরূপ অংকন করা হয়। এ পদ্ধতির সুবিধা এই যে, এদের সমন্নয়ে অল্প ব্যায়ে অধিক সুন্দররূপে ভূপ্রকৃতির চিত্র অংকন করা যায়।

(ঙ) সমোন্নতি রেখা ও স্তরীভূত রং (Cantours and Layer Tints)ঃ অনেক সময় দু'টি সমোন্নতি রেখার মধ্যবর্তী অংশে রং ব্যবহার করে ভূমিরূপের চিত্র অংকন করা হয়। সাধারণত সমুদ্র পৃষ্ঠ ও ১০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট সমোন্নতি রেখার মধ্যবর্তী অংশে গাঢ় সবুজ, ১০০০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট স্থানগুলোতে হালকা সবুজ, অপেক্ষাকৃত উঁচু ভূভাগে হালকা থেকে গাঢ় বিভিন্ন শ্রেণীর বাদামী এবং ১৫,০০০ ফুটের চেয়ে উচু ভূভাগের উচ্চতা দেখাতে অত্যন্ত গাঢ় বাদামী রং ব্যবহার করা হয়।

পাঠসংক্ষেপ

সমুদ্র সমতল হতে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের উন্নতিকে উচ্চতা বলে। ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থ উঁচু ও নিচু স্থানগুলোর সামগ্রিক রূপকে ভূমি বন্ধুরতা বলা হয়। বিশেষ কৌশল ও অংকন পদ্ধতি অবলম্বন করে সমতল কাগজের উপর ভূমি বন্ধুরতা প্রদর্শন করা হলে তাকে ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র বলা হয়। মানচিত্রে ভূমি বন্ধুরতা প্রদর্শনের পদ্ধতিসমূহ প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। সচিত্র পদ্ধতিতে ভ্রুলেখা, ছায়াপাত এবং স্তরীভূত রঙের মাধ্যমে ভূমি বন্ধুরতা দেখানো হয়। গাণিতিক পদ্ধতিতে স্পট হাইট, বেঞ্চ মার্ক, ত্রিকোণমিতিক ষ্টেশন, সমোন্নতি রেখা এবং ফর্ম লাইনের মাধ্যমে ভূমি বন্ধুরতা দেখানো হয়। আবার সচিত্র এবং গাণিতিক পদ্ধতির সমন্নয়ে আরো বিস্তারিত ও সুন্দরভাবে ভূমি বন্ধুরতা দেখানোর একটি তৃতীয় পদ্ধতিও রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১.১. কোন আদর্শ সমতল হতে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের উন্নতিকে ..... বলে।

১.২. ..... মানচিত্র অংকনে ভূমিবন্ধুরতা মানচিত্রের অনেক কৌশল অনুসরন করা হয়।

১.৩. পানি প্রবাহের ..... অনুযায়ী ভ্রুলেখা বিন্যস্ত থাকে।

১.৪. গভীর সমুদ্র নির্দেশ করবার জন্য অত্যন্ত ..... রং ব্যবহার করা হয়।

১.৫. পরস্পর সন্নিহিত দুই সমোন্নতি রেখার মধ্যে নির্দিষ্ট ..... ব্যবধান থাকে।

২. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

২.১. পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম রেখার সমষ্টিকে ছায়াপাত বলে।

২.২. ছায়াপাত পদ্ধতি কোন ভূমির উচ্চতা এবং ক্রমোন্নতি সম্পর্কে সম্পূর্ন সঠিক ধারণা দিতে পারে।

২.৩. স্তরীভূত রং পদ্ধতিতে পার্বত্য অঞ্চল বুঝাবার জন্য খয়েরী রং ব্যবহার করা হয়।

২.৪. সমোন্নতি রেখার সাহায্যে কোন স্থানের কোন দিক কতটা ঢালু তা বুঝতে পারা যায় এবং ঢাল নির্ণয় করা যায়।

২.৫. সমোন্নতি রেখার প্রায় অনুরূপ একটি পদ্ধতি হচ্ছে ফর্ম লাইন।

৩. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন

৩.১. ভূমি বন্ধুরতা প্রদর্শনের সর্বাধুনিক ও সবচেয়ে প্রচলিত পদ্ধতি কোনটি ?

(ক) ছায়াপাত (খ) স্তরীভূত রং

(গ) ভ্রুলেখা (ঘ) সমোন্নতি রেখা

৩.২. সমতল ভূমি এলাকায় অগভীর উপত্যকা বা ছোট টিলা দেখাতে ব্যবহার করা হয়।

(ক) ফর্ম লাইন (খ) ভ্রুলেখা

(গ) ছায়াপাত (ঘ) সমোন্নতি রেখা

৩.৩. তীর্যক আলোকপাত পদ্ধতিতে মানচিত্রের কোন দিক হতে আলো আসছে বলে কল্পনা করা হয় ?

(ক) উত্তর-পশ্চিম (খ) উত্তর-পূর্ব

(গ) দক্ষিণ-পশ্চিম (ঘ) দক্ষিণ-পূর্ব

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভূমি বন্ধুরতা এবং ভূমি বন্ধুরতা মানচিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

২. ভ্রুলেখা পদ্ধতিতে ভূমি বন্ধুরতা প্রদর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

৩. ছায়াপাত পদ্ধতিতে ভূমি বন্ধুরতা প্রদর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

৪. স্তরীভূত রং পদ্ধতিতে ভূমি বন্ধুরতা প্রদর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

৫. সমোন্নতি রেখা পদ্ধতিতে ভূমি বন্ধুরতা প্রদর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সমতল কাগজে ভূমি বন্ধুরতা প্রদর্শনের সচিত্র পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করুন।

২. ভূমি বন্ধুরতা প্রদর্শনের গাণিতিক পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন।

পাঠ-৪.২ সমোন্নতি রেখা ও পার্শ্বচিত্র

এই পাঠ শেষে আপনি-

- **স্পট হাইট হতে সমোন্নতি রেখার সন্নিবেশ সম্পর্কে জানতে পারবেন; এবং**
- **সমোন্নতি রেখা হতে পার্শ্বচিত্র অংকন প্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন।**

পূর্ববর্তী পাঠ ৪.১ হতে আমরা স্পট হাইট এবং সমোন্নতি রেখা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা লাভ করেছি। আমরা জেনেছি যে, স্পট হাইট দেয়া থাকলে তা থেকে সমোন্নতি রেখা অংকন করা সম্ভব এই অধ্যায়ে আমরা সমোন্নতি রেখা এবং পার্শ্বচিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা অর্জনের পাশাপাশি স্পট হাইট হতে সমোন্নতি রেখা এবং সমোন্নতি রেখা হতে পার্শ্বচিত্র অংকনের পদ্ধতি শিখব।

পার্শ্বচিত্র (Profile)

সমোন্নতিরেখা অংকন করার জন্য সমুদ্র সমতল থেকে বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা মেপে সমান উচ্চতা বিশিষ্ট স্থানগুলোকে মানচিত্রে এক একটি রেখা দ্বারা যুক্ত করা হয়। অতঃপর উক্ত এলাকাকে একটি সরলরেখা বরাবর নিচের দিকে (Vertically) কেটে ফেললে সে কাটা রেখা বরাবর স্থানটির যে অবস্থা বা রূপ পাশ থেকে দেখা যায় তাকে ঐ স্থানের পার্শ্বচিত্র বলে। সুতরাং ভূমির উচ্চতা ও ঢাল ভালভাবে বুঝাবার জন্য এর পার্শ্বচিত্র অংকন করা সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি। কোন স্থানের পার্শ্বচিত্র দেখাবার জন্য সে স্থানের প্রস্থচ্ছেদ অংকন করতে হয়।

পার্শ্বচিত্র অংকন করার জন্য একটি স্থানের সমোন্নতি রেখা মানচিত্র প্রয়োজন হয়। আর আগেই জেনেছি যে, সমোন্নতি রেখা মানচিত্র তৈরি করা হয় স্পট হাইট থেকে। তাই প্রথমে আমরা স্পট হাইট থেকে সমোন্নতি রেখা তৈরি করা শিখব।

সমোন্নতি রেখার সন্নিবেশ

কোন মানচিত্রে বিভিন্ন স্থানের স্পট হাইট (Spot Height) দেয়া থাকলে এদের মাধ্যমে সমোন্নতি রেখা অংকনের কৌশলকে সমোন্নতিরেখা সন্নিবেশ (Interpolation of Contour lines) বলা হয়। চিত্র ৪.২.১ এ একটি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানের স্পট হাইট দেখানো হয়েছে। মনে করা যাক, এখানে প্রতি ১০০ ফুট বিরতিতে সমোন্নতি রেখা অংকন করতে হবে। প্রথমে ৩০০′ উচ্চতার সমোন্নতি রেখার জন্য ৩০০′ এর কাছাকাছি মান বিশিষ্ট স্পট হাইটসমূহকে বিবেচনা করে

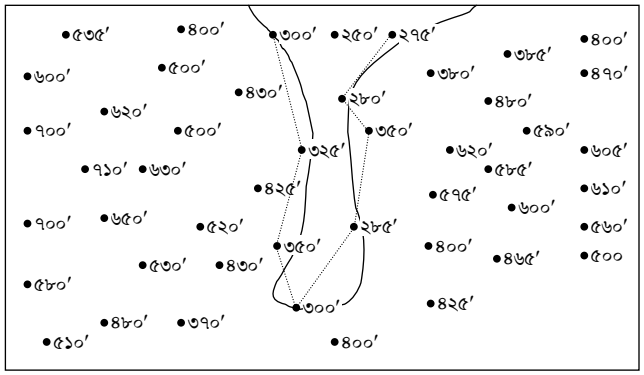

চিত্র ৪.২.১ স্পট হাইট হতে সমোন্নতি রেখার সন্নিবেশ পদ্ধতি

তাদের পারস্পরিক আনুপাতিক দূরত্ব পরিমাপ করতে হবে। সাধারণত আনুপাতিক দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য কাছাকাছি মানের স্পট হাইটসমূহকে ভাঙ্গা রেখা দিয়ে সংযুক্ত করে নেয়া হয়। এবার অনুপাতিক দূরত্ব অনুযায়ী ৩০০ ফুট রেখা কোন স্থান দিয়ে যাওয়া উচিৎ তা ঠিক করে ৩০০′ উচ্চতার সমোন্নতি রেখাটি অংকন করতে হবে। একই ভাবে ৪০০ ফুটের কাছাকাছি স্পট হাইটসমূহকে সংযুক্ত করে আনুপাতিক দূরত্ব অনুযায়ী ৪০০′ সমোন্নতি রেখা অংকন করতে হবে। এভাবে যথাক্রমে

৫০০′, ৬০০′ এবং ৭০০′ এর সমোন্নতি রেখা অংকন করলে পুরো এলাকার সমোন্নতি রেখা মানচিত্র পাওয়া যাবে (চিত্র ৪.২.২)। এই পদ্ধতিতে ৫০ ফুট ব্যবধানেও সমোন্নতি রেখা অংকন করা সম্ভব।

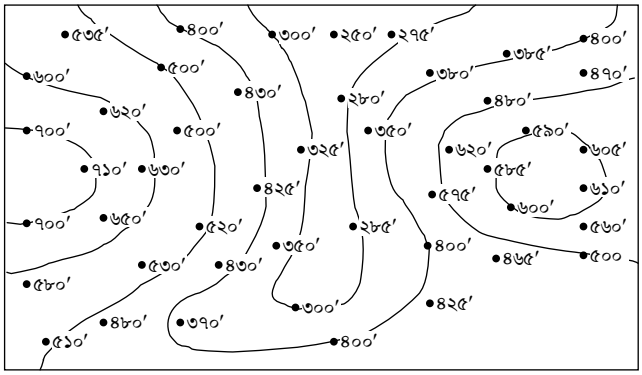

চিত্র ৪.২.২ স্পট হাইট হতে সমোন্নতি রেখার সন্নিবেশ

সমোন্নতি রেখা হতে পার্শ্বচিত্র অংকন পদ্ধতি

ভূমির বন্ধুরতা প্রদর্শনের একটি পদ্ধতি হচ্ছে সমোন্নতি রেখা। সমোন্নতি রেখা মানচিত্রের পার্শ্বচিত্র ঐ স্থানের বন্ধুরতার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে। যে অংশের পার্শ্বচিত্র অংকন করতে হবে সেখানকার সমোন্নতি রেখাগুলোর উপর দিয়ে একটি সরল রেখা এমনভাবে টানতে হবে যেন তা সব সমোন্নতি রেখাকে ছেদ করে। সমোন্নতি রেখা হতে প্রস্থচ্ছেদ অংকনের জন্য দু'টি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

প্রথম পদ্ধতি ঃ সমোন্নতি রেখা মানচিত্রে নির্দিষ্ট পার্শ্বচিত্র অংকন করার জন্য **ক খ** রেখা নির্ধারণ করতে হবে (চিত্র ৪.২.৩)। এরপর, প্রথমে এক খন্ড কাগজ ভাঁজ করে **ক খ** রেখার উপর স্থাপন করে কাগজের সাথে সমোন্নতি রেখার ছেদবিন্দুগুলো (Cutting pints) বরাবর ঐ কাগজের উপর দাগ চিহ্নিত করতে হবে এবং সমোন্নতি মাপ লিখতে হবে। দ্বিতীয়ত অন্য

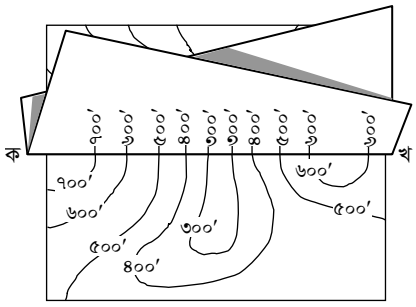

চিত্র ৪.২.৩ কাগজে পাঠ গ্রহন

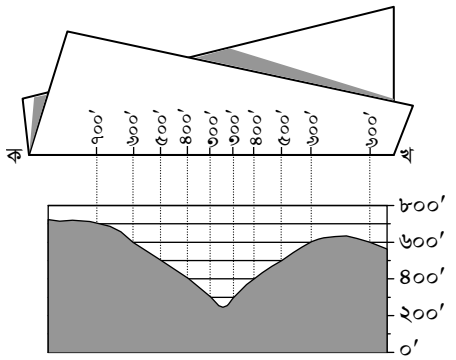

চিত্র ৪.২.৪ পার্শ্বচিত্র অংকন

একটি সাদা কাগজের উপর **ক খ** এর সমান সরল রেখা অংকন করে একটি নির্দিষ্ট উলম্ব স্কেল অনুযায়ী এদের উচ্চতা (১০০, ২০০ ফুট প্রভৃতি) পাশে লিখতে হবে (চিত্র ৪.২.৪)। তৃতীয়ত ভাঁজ করা কাগজটি রেখাগুলো উপর এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন, যে দিকে **ক** বিন্দু আছে তা সরল রেখাগুলোর **ক** বিন্দু সূচক উলম্ব রেখার উপর পড়ে। একের পর এক ভাঁজ করা কাগজটি বিভিন্ন রেখায় স্থাপন করে উচ্চতা অনুসারে বিভিন্ন সমোন্নতি রেখার অবস্থান বিন্দু চিহ্নিত করতে হবে। বিভিন্ন রেখার উপর চিহ্নিত বিন্দুগুলো সংযোজক বাঁকারেখাটি হবে এলাকাটির পার্শ্বচিত্র। কোন সমোন্নতি রেখা মানচিত্র থেকে ভিন্ন কাগজে পার্শ্বচিত্র অংকন করতে হলে এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি ঃ অনেক সময় সমোন্নতি রেখা যে কাগজে রয়েছে সেই একই কাগজে নীচের দিকে সরাসরি পার্শ্বচিত্র অংকন করতে হয়। এজন্য যে কাগজে সমোন্নতি রেখার চিত্র অংকন করা হয়েছে তার নিচের দিকে সমব্যবধানে **ক খ** এর সমান সরল রেখা অংকন করে আগের মত নির্দিষ্ট উলম্ব স্কেল অনুযায়ী এদের উচ্চতা (১০০, ২০০ ফুট প্রভৃতি) পাশে লিখতে

হবে। অতপর **ক খ** রেখাকে সমোন্নতি রেখাগুলো যে বিন্দুতে ছেদ করেছে সেই বিন্দুগুলো থেকে সমকোণে নিচের দিকে রেখা বর্ধিত করে উচ্চতানুসারে বিভিন্ন রেখায় মিলিত করতে হবে। এখন উলম্ব ব্যবধানের স্কেল অনুযায়ী প্রত্যেক লম্ব থেকে সেই সব স্থানের সমোন্নতির পরিমাণ কেটে নিয়ে ঐ লম্বগুলোর শীর্ষবিন্দুগুলো যোগ করে যে বাঁকারেখাটি পাওয়া যাবে সেটিই হবে ঐ স্থানের পার্শ্বচিত্র।

পার্শ্বচিত্র অংকন করার সময় স্কেলের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। মানচিত্রের আনুভূমিক পরিমাণ যে স্কেল অনুযায়ী হবে উলম্ব স্কেলও ঐ একই মাপে হবে। অবশ্য উলম্ব স্কেলকে প্রয়োজনবোধে সামঞ্জস্য রেখে ছোট-বড় করা যায়। তবে উলম্ব স্কেল আনুভূমিক স্কেলের ২০ গুনের বেশি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

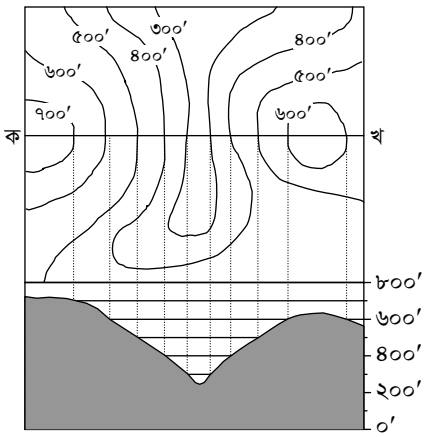

চিত্র ৪.২.৫ সরাসরি পার্শ্বচিত্র

উলম্ব স্কেলের অতিরিক্ততা

সাধারণত ভূমির প্রকৃত রূপ বুঝবার জন্য মূল মানচিত্র এবং পার্শ্বচিত্র উভয়ের স্কেল সমান হওয়া উচিত। তবে অনেক সময় পার্শ্বচিত্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং এর আকৃতি স্পষ্ট করার জন্য মূল মানচিত্রের স্কেলের চেয়ে পার্শ্বচিত্রের উলম্ব স্কেলকে কিছুটা বাড়িয়ে ধরা হয়। মনে করি, কোন মানচিত্রের অনুভূমিক স্কেল ১ ইঞ্চিতে ১ মাইল এবং উলম্ব স্কেল ১ ইঞ্চিতে ১,০০০ ফুট ধরা হয়েছে। এতে বুঝতে পারা যায় যে প্রস্থচ্ছেদে যে ঢাল দেখান হয়েছে তা ঠিক নয়; প্রকৃত ঢাল অপেক্ষা এটি অত্যন্ত খাঁড়া। উলম্ব স্কেলের অতিরিক্ততার ফলে ভূ-প্রকৃতিকে ব্যাপকভাবে দেখান সম্ভব হয় না। পাহাড় বা পর্বতের চূড়া, মালভূমি, বহিপ্রসুত ভূভাগ, উপত্যকা প্রভৃতি ভূমিরূপ স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হওয়ায় এদের তুলনামূলক আলোচনা করা সম্ভব নয়। মানচিত্রের অনুভূমিক স্কেলের উপর এর উলম্ব স্কেলের অতিরিক্ততা নির্ভর করে। উলম্ব স্কেলের এ অতিরিক্ততা সহজেই নিরূপণ করা যায়। এর সূত্র হচ্ছে *V.L/H.E. = উলম্ব স্কেল/অনুভূমিক স্কেল* এক্ষেত্রে অনুভূমিক স্কেল ১ ইঞ্চিতে ৫,২৮০ ফুট (১ মাইল = ৫২৮০ ফুট) এবং উলম্ব স্কেল ১ ইঞ্চি = ১,০০০ ফুট প্রকাশ করছে। অতএব উলম্ব স্কেলের অতিরিক্ততা হবে ৫,২৮০ ÷ ১,০০০ = ৫.২৮। এই পরিমান পার্শ্বচিত্রের নিচে উলে-খ করতে হয়। আলোচ্য পার্শ্বচিত্রের নিচে '*উচ্চতার অতিরিক্ততা ৫.২৮ গুণ*' (Times) কথাটি লিখতে হবে।

সমোন্নতি রেখার সাহায্যে বিভিন্ন ভূমির অবয়ব প্রদর্শনের নিয়ম

অনেক সময় কোন স্থানের বর্ণনার উপর নির্ভর করে হিমবাহ, প্রবাহমান নদী বিধৌত ভূমিরূপ, বায়ু প্রভাবিত বা চুনাপাথর সমৃদ্ধ অঞ্চলের ভূমিরূপগুলো সমোন্নতিরেখার সাহায্যে দেখাতে হয়। আবার অনেক সময় একই ভূখন্ডে পাহাড়, মালভূমি স্পার, উপত্যকা, ক্ষুদ্র টিলা, প্রণবভূমি, গিরিপথ, প্রশস্ত গিরিপথ, প্রশস্ত নদী, উপনদী, শাখানদী, রাস্তা প্রভৃতি দেখাতে হয়। সমোন্নতি রেখার প্রাথমিক মৌলিক নিয়মাবলী সম্বন্ধে ভাল ধারণা থাকলে বর্ণনার উপর ভিত্তি করে সমন্নোতি রেখার সাহায্যে বন্ধুরতা প্রদর্শন বা সমোন্নতি রেখা দেখে বন্ধুরতার বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা সহজ হয়। এরূপ কোন সমস্যা সমাধানের সময় নিচে উলে-খিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

১। সমোন্নতি রেখা সমুদ্র সমতল থেকে সমান উচ্চতা বিশিষ্ট পাশাপাশি অবস্থিত বিভিন্ন স্থানসমূহকে মানচিত্রের উপর সংযুক্ত করে। অর্থাৎ এটি - (ক) সমান উচ্চতা বিশিষ্ট স্থানগুলো যোগ করে। (খ) সংযুক্ত স্থানগুলো পাশাপাশি অবস্থিত হতে হবে।

২। পূর্ণ সমোন্নতি রেখা একটি অবিচ্ছিন্ন রেখাংশ এবং কখনও অপর একটি সমোন্নতি রেখাকে ছেদ করেনা। উপকূলবর্তী উন্নত ভূভাগ (Cliff), জল প্রপাত (Waterfall) অথবা অত্যন্ত খাড়া ঢাল বিশিষ্ট ভূভাগের ক্ষেত্রে একটি সমোন্নতি রেখা অপর একটি সমোন্নতি রেখার সাথে মিলিত হয়ে একটি রেখা সৃষ্টি করে চলে। কিন্তু ঢাল একটু কম হলেই রেখাগুলো আলাদা হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

৩। একই উচ্চতা বিশিষ্ট একাধিক সমোন্নতি রেখা একত্রে মিলিত হয়ে একটি রেখা হিসাবে অগ্রসর হয় না।

৪। সমোন্নতি রেখাগুলোর মধ্যবর্তী ব্যবধান দেখে কোন স্থানের ঢালের প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়।

৫। মানচিত্রের মধ্যস্থলে কোন সমোন্নতি রেখা শুরু বা শেষ হয় না। রেখাগুলো আঁকাবাঁকা হয়ে মানচিত্রের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যায়, অথবা বৃত্ত বা উপবৃত্তাকারে ক্রমশঃ ছোট হয়ে উন্নত ভূভাগের অবস্থান জ্ঞাপন করে।

৬। বৃত্ত বা উপবৃত্তকারে বিন্যস্ত সমোন্নতি রেখাগুলোর মান ভেতরের দিকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেলে তা পাহাড়ের অবস্থান বোঝায়।

৭। বৃত্ত বা উপবৃত্তকারে বিন্যস্ত সমোন্নতি রেখাগুলোর মান ভেতরের দিকে ক্রমশঃ হ্রাস পেলে তা নিম্নভূমি, অববাহিকা বা পর্যাঙ্কের অবস্থান নির্দেশ করে।

৮। শৈলশিরার ক্ষেত্রে সমোন্নতি রেখাগুলো দীর্ঘ ও সমান্তরাল এবং শীর্ষভাবে উপবৃত্তাকার বা গোল হয়।

বর্ণনা অনুযায়ী সমোন্নতি রেখার নকশাচিত্র (Sketch) অংকন শুরু করার পূর্বে বর্ণনাটি বারবার সাবধানতার সাথে পড়ে তারপর ভূমিরূপের চিত্র অংকন করতে হবে। অতঃপর নির্দিষ্ট স্কেল অনুসারে এলাকাটির সীমারেখা অংকন এবং উত্তর দিক চিহ্নিত করতে হবে। এর পর ক্রমান্বয়ে নিচে উলে- খিত পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

(ক) অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকাগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রধান প্রধান ভূমিরূপগুলো হাল্কাভাবে অংকন করতে হবে।

(খ) অতঃপর উচ্চভূমি থেকে আগত নদীগুলো এবং এদের উপনদীগুলো অংকন করতে হবে।

(গ) বর্ণনা অনুসারে অন্যান্য ভূমিরূপগুলো যথাস্থানে অংকন করতে হবে।

(ঘ) প্রথমে নিম্নমানের সমোন্নতি রেখাগুলো নদীর নিম্নাংশ বরাবর অংকন করতে হবে। পরে নির্দিষ্ট ব্যবধানে অন্যান্য সমোন্নতি রেখা অংকন করতে হবে।

(ঙ) ঢালের বিভিন্নতা, গিরিখাত, ঢালু পার্শ্বদেশ প্রভৃতি দেখাবার জন্য প্রয়োজনবোধে ভ্রুলেখার মত ভিন্নতর কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে।

পাঠসংক্ষেপ

সমোন্নতি রেখা মানচিত্রকে একটি সরলরেখা বরাবর নিচের দিকে (Vertically) কেটে ফেললে সে কাটা রেখা বরাবর স্থানটির যে অবস্থা বা রূপ পাশ থেকে দেখা যায় তাকে ঐ স্থানের পার্শ্বচিত্র বলে। ভূমির উচ্চতা ও ঢাল ভালভাবে বুঝাবার জন্য এর পার্শ্বচিত্র অংকন করা সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি। স্পট হাইট থেকে সমোন্নতি রেখা মানচিত্র তৈরি করা হয়। স্পট হাইট (Spot height) হতে সমোন্নতি রেখা অংকনের কৌশলকে সমোন্নতিরেখা সন্নিবেশ (Interpolation of Contour lines) বলা হয়। । সমোন্নতি রেখা মানচিত্রের পার্শ্বচিত্র ঐ স্থানের বন্ধুরতার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে। অনেক সময় পার্শ্বচিত্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং এর আকৃতি স্পষ্ট করার জন্য মূল মানচিত্রের স্কেলের চেয়ে পার্শ্বচিত্রের উলম্ব স্কেলকে কিছুটা বাড়িয়ে ধরা হয়। একটি সমোন্নতি রেখা কখনও অপর একটি সমোন্নতি রেখাকে ছেদ করেনা। একই উচ্চতা বিশিষ্ট একাধিক সমোন্নতি রেখা একত্র মিলিত হয়ে একটি রেখা হিসাবে অগ্রসর হয় না। সমোন্নতি রেখাগুলোর মধ্যবর্তী ব্যবধান দেখে কোন স্থানের ঢালের প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১.১. কোন স্থানের পার্শ্বচিত্র দেখাবার জন্য সে স্থানের ..... অংকন করতে হয়।

১.২. সমোন্নতি রেখা মানচিত্রের পার্শ্বচিত্র ঐ স্থানের ..... প্রকৃত রূপ সম্পর্কে ধারনা প্রদান করে।

১.৩. পার্শ্বচিত্র অংকন করার সময় ..... প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

১.৪. তবে উলম্ব স্কেল আনুভূমিক স্কেলের ..... গুনের বেশি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

১.৫. একই উচ্চতা বিশিষ্ট ..... সমোন্নতি রেখা একত্র মিলিত হয়ে একটি রেখা হিসাবে অগ্রসর হয় না।

২. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

২.১. সমোন্নতি রেখা মানচিত্র তৈরি করা হয় বেঞ্চ মার্ক থেকে।

২.২. আনুপাতিক দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য কাছাকাছি মানের স্পট হাইটসমূহকে ভাংগা রেখা দিয়ে সংযুক্ত করে নেয়া হয়।

২.৩. সমোন্নতি রেখা হতে প্রস্থচ্ছেদ অংকনের জন্য চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

২.৪. মানচিত্রের অনুভূমিক স্কেলের উপর এর উলম্ব স্কেলের অতিরিক্ততা নির্ভর করে না।

২.৫. সমোন্নতি রেখায় সংযুক্ত স্থানগুলো পাশাপাশি অবস্থিত হতে হবে।

৩. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন

৩.১. পার্শ্বচিত্র অংকন করার জন্য প্রয়োজন হয় একটি স্থানের -

(ক) সমোন্নতি রেখা মানচিত্র (খ) ভ্রু লেখা মানচিত্র

(গ) স্পট হাইট (ঘ) বেঞ্চ মার্ক

৩.২. স্পট হাইট হতে সমোন্নতি রেখা অংকনের কৌশলকে বলা হয় -

(ক) সমোন্নতি রেখা (খ) সমোন্নতি রেখা সন্নিবেশ

(গ) সমোন্নতি রেখার উন্নয়ন (ঘ) পার্শ্বচিত্র সমোন্নতি রেখা

৩.৩. বৃত্ত বা উপবৃত্তকারে বিন্যস্ত সমোন্নতি রেখাগুলোর মান ভেতরের দিকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেলে তা বোঝায় -

(ক) মালভূমির অবস্থান (খ) সমভূমির অবস্থান

(গ) স্পারের অবস্থান (ঘ) পাহাড়ের অবস্থান

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পার্শ্বচিত্র কাকে বলে ?

২. সমোন্নতি রেখা সন্নিবেশ ব্যাখ্যা করুন।

৩. সমোন্নতি রেখা অংকনের নিয়মাবলী লিখুন।

৪. সমোন্নতি রেখা হতে পার্শ্বচিত্র অংকনের যে কোন একটি পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. স্পট হাইট হতে সমোন্নতি রেখা এবং সমোন্নতি রেখা হতে পার্শ্বচিত্র অংকনের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

পাঠ-৪.৩ কতিপয় বিশেষ ভূমিরূপের পার্শ্বচিত্র

এই পাঠ শেষে আপনি-

- **কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিরূপের পার্শ্বচিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন।**

পূর্ববর্তী পাঠ ৪.২ হতে আমরা সমোন্নতি রেখার মাধ্যমে ভূমি বন্ধুরতার পার্শ্বচিত্র অংকন প্রণালী সম্পর্কে জানতে পেরেছি। পৃথিবীপৃষ্ঠে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ দেখা যায়। সমোন্নতি রেখার মাধ্যমে এইসকল ভূমিরূপের পার্শ্বচিত্র অংকন করা সম্ভব। নীচে এমন কিছু ভূমিরূপের বর্ণনা এবং পার্শ্বচিত্র দেয়া হল।

পর্বত (Mountain)ঃ আশেপাশের এলাকার চেয়ে ৩,০০০ ফুট বা তারও বেশি উচ্চতা বিশিষ্ট বিস্তৃত ভূ-ভাগকে পর্বত বলে। পর্বতের সমোন্নতি রেখাগুলোর মান ক্রমশ ভিতর দিকে বৃদ্ধি পায়। সমোন্নতি রেখার প্রকৃতি দেখে পর্বতটি কি ধরনের অর্থাৎ এটি দীর্ঘ, সংকীর্ণ, বিস্তৃত, প্রশস্ত বা সমতল শীর্ষ বিশিষ্ট কি না তা বুঝতে পারা যায়।

পাহাড় (Hill)ঃ অল্প এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এবং পার্শ্ববর্তী স্থান অপেক্ষা ১,০০০ ফুটের কম উচ্চতা বিশিষ্ট ভূভাগকে পাহাড় বলে। সমোন্নতিরেখাগুলোর মধ্যবর্তী ব্যবধান দেখে এরূপ পাহাড়ের ধরন বোঝা যায়। অর্থাৎ এটি গম্বুজাকৃতি বা সমতল শীর্ষ বিশিষ্ট, সুষম বা খাড়া ঢাল বিশিষ্ট কিনা তা সমোন্নতি রেখা দেখে বুঝতে পারা যায়। সমোন্নতি রেখার কেন্দ্রে সাদা অংশ থাকলে পাহাড়ের শীর্ষ সমতল বুঝায়।

শাঙ্কব পাহাড় (Conical hill)ঃ চারিদিক থেকে ভূমি প্রায় সমান হারে উঁচু হয়ে উঠে যে পাহাড়ের সৃষ্টি করে তার আকৃতি শাঙ্কব বা কোনাকৃতি সদৃশ্য। এই পাহাড়ের ঢাল যদি সব দিকে সমান হয় তবে সমোন্নতি রেখাগুলো বৃত্তাকার হবে। এ ধরনের বৃত্তাকার সমোন্নতি রেখাগুলোর কেন্দ্রে যদি একটি বিন্দু থাকে ও এর উচ্চতা লেখা থাকে তা হলে পাহাড়ের চূড়া শাঙ্কব আকৃতির হয়।

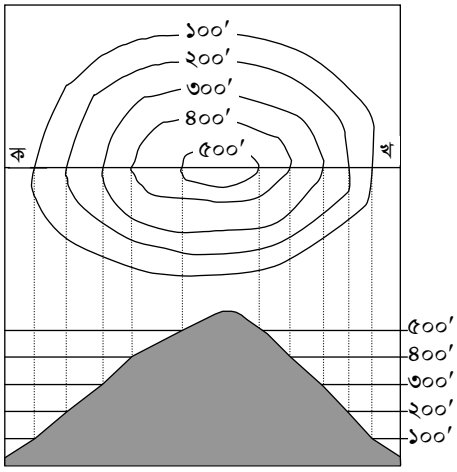

চিত্র ৪.৩.১ শাঙ্কব পাহাড়

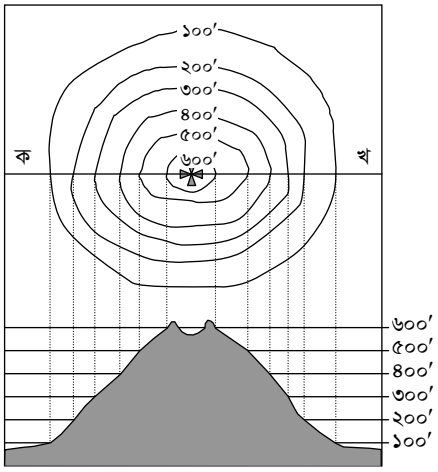

চিত্র ৪.৩.২ আগ্নেয়গিরি

আগ্নেয়গিরি (Volcano)ঃ ভূ-পৃষ্ঠের কোন দুর্বল অংশ দিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত গলিত পদার্থ নির্গত হবার পর সঞ্চিত হয়ে যে পাহাড়ের সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয়গিরি বলে। সাধারণ শাঙ্কব আকৃতির পাহাড়ের সাথে এর পার্থক্য এই যে, আগ্নেয়গিরির কেন্দ্রস্থলে একটি গহবর বা মুখ থাকে, এটি জ্বালামুখ নামে পরিচিত। শাঙ্কব আকৃতির আগ্নেয়গিরির সমোন্নতি রেখা অংকন করার সময় স্বাবলীল হাতে একটির মধ্যে অন্য বৃত্তগুলো অংকন করতে হয়। মধ্যস্থলে জ্বালামুখের অবস্থান দেখাবার জন্য মধ্যের বৃত্তটির পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে কতিপয় রেখা অংকন করতে হয়, অবশ্য এ রেখাগুলো পরস্পর মিলিত হবে না।

দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট পাহাড় (Double Peak Hill)ঃ একটি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কয়েকটি সমোন্নতি রেখা বৃত্তাকারে অবস্থিত হলে এবং তারপর এর দুই অংশে আলাদাভাবে বিভিন্ন উচ্চতা বিশিষ্ট কতিপয় বৃত্তকার সমোন্নতি রেখা অঙ্কিত থাকলে বুঝতে হতে যে, এক বিস্তৃত পাহাড়ী অঞ্চলের ঐ স্থানে দুইটি শৃঙ্গ রয়েছে। দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট এরূপ বৃহৎ পাহাড়কে ম্যাসিফ (Massif) নামেও অভিহিত করা হয়।

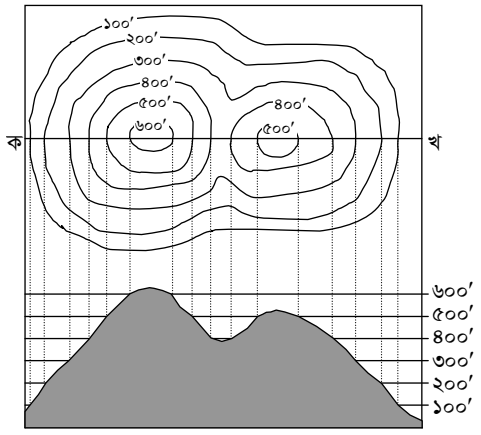

চিত্র ৪.৩.৩ দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট পাহাড়

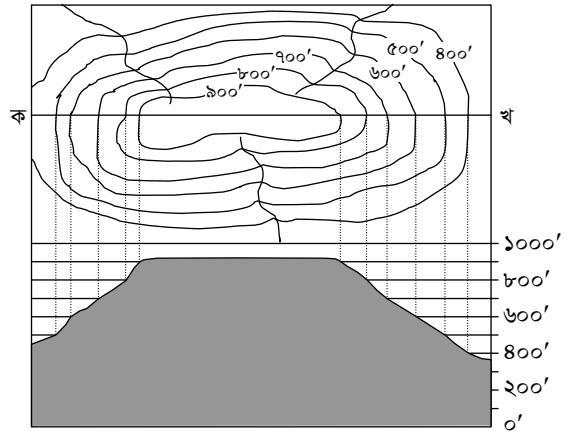

চিত্র ৪.৩.৪ মালভূমি

মালভূমি (Plateau)ঃ বিশাল এলাকা জুড়ে যে উঁচু সমতল ভূমি বিদ্যমান তাকে মালভূমি বলে। এর পার্শ্বদেশ খাঁড়া ঢাল বিশিষ্ট। এই ঢাল বেয়ে বিভিন্ন নদী বয়ে যেতে পারে। অনেক সময় বিভিন্ন নদী দ্বারা মালভূমি ব্যবচ্ছেদিত হয়।

প্রণবভূমি (Escarpment)ঃ অনেক সময় পানি বিভাজিকা উপকূলের সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থিত হয় এবং উপকূলের দিকের ভূমি অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত ও খাঁড়া ঢাল বিশিষ্ট কিন্তু বিপরীত দিকের অংশ প্রশস্ত ও কম ঢাল বিশিষ্ট হয়। এ ধরনের উপকূলীয় পানি বিভাজিকার অপ্রশস্ত খাঁড়া অংশকে প্রণবভূমি বলে। চিত্র ৪.৩.৫ এ দেখা যাচ্ছে বামদিকের সমোন্নতি রেখাগুলো প্রায় গায়ে লেগে রয়েছে, অর্থাৎ সেখানে ভূমি যথেষ্ট খাঁড়া ঢাল বিশিষ্ট। অতঃপর মধ্যস্থলের বিস্তৃত অংশের উচ্চতা প্রায় সমান। কিন্তু ডানদিকে সমোন্নতি রেখাগুলোর মধ্যে ব্যবধান বেশি। সেখানে ভূমি মৃদু ঢাল বিশিষ্ট। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে যে, ডান দিকের ভূমি ক্রমশ ঢালু হয়েছে।

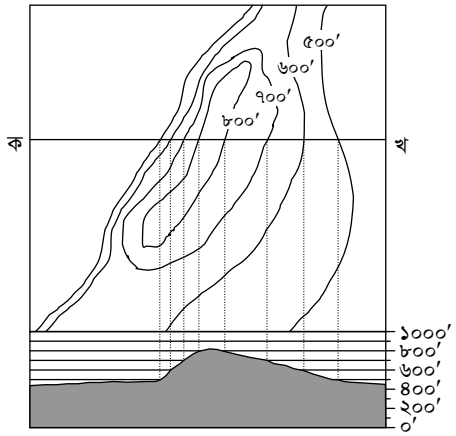

চিত্র ৪.৩.৫ প্রণবভূমি

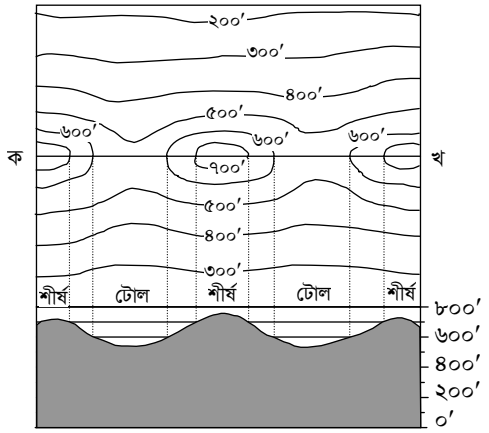

চিত্র ৪.৩.৬ শৈলশিরা

শৈলশিরা (Ridge)ঃ দূরে দূরে বিন্যস্ত সমোন্নতি রেখা বিশিষ্ট প্রলম্বিত পাহাড়ী এলাকাকে শৈলশিরা বলে। এ ধরনের ভূমিরূপে মাঝে মধ্যে কোথাও ঘন ঘন দুই একটি উঁচু মানের গোলাকার সমোন্নতি রেখা দেখা যায় যা শৈলশিরার শীর্ষ (Summit) নির্দেশ করে। আবার দুই শীর্ষের মধ্যবর্তী অংশে অপেক্ষাকৃত নীচু টোল (Col) দেখা যায়। দীর্ঘ প্রলম্বিত শৈলশিরায় অনেক শীর্ষ এবং টোল থাকতে পারে।

নল বা ক্ষুদ্র টিলা (Knoll)ঃ নীচু পাহাড় বা টিলার চেয়ে ছোট ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উঁচু ঢিবি জাতীয় ভূমিরূপকে নল বলা হয়। সাধারণত নলের আকৃতি গোলাকার হয়ে থাকে। নলের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত বেশী হলে তাকে ছোট পাহাড় বলা হয়। পাদদেশীয় এলাকার সমতলভূমিতে শিলারাশি সঞ্চিত হয়ে এই ধরনের ছোট টিলা গঠিত হতে দেখা যায়। এছাড়াও নদী বিধৌত সমভূমি এলাকায় পুরাতন পলল জমা হয়ে এ ধরনের ভূমিরূপ তৈরি হতে পারে। ক্রমে এখানে জনবসতি গড়ে উঠে।

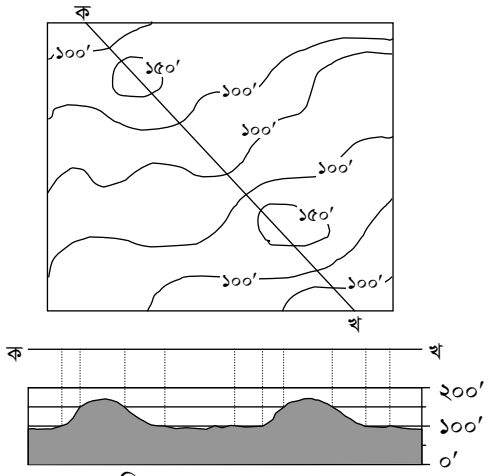

চিত্র ৪.৩.৭ নল

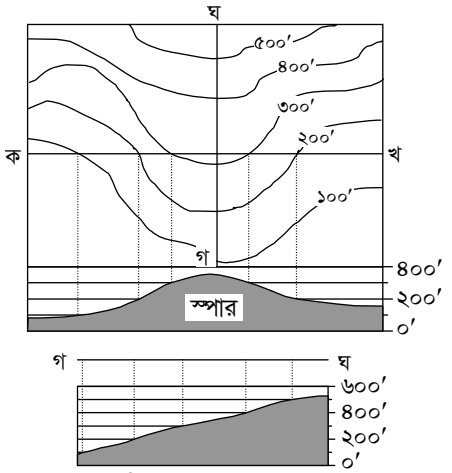

চিত্র ৪.৩.৮ স্পার

স্পার (Spur)ঃ নিম্ন ভূমির দিকে প্রলম্বিত উচ্চভূমিকে স্পার বলে। এতে সমোন্নতিরেখাগুলো নিম্ন সমোন্নতি রেখার দিকে বেঁকে উত্তল ঢালের সৃষ্টি করে। এর সমোন্নতি রেখাগুলোর মান ভিতর দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রস্থচ্ছেদ অংকন করলে উৎপন্ন ভূভাগ উন্নত দেখায়। চিত্র ৪.৩.৮ এ দেখা যাচ্ছে সমোন্নতিরেখাগুলো **গ ঘ** প্রস্থচ্ছেদ অনুযায়ী ক্রমশঃ ঢালু হয়েছে কিন্তু **ক খ** প্রস্থচ্ছেদ অনুযায়ী সমোন্নতিরেখাগুলো বেঁকে গিয়ে উঁচু স্পার গঠন করেছে।

উপত্যকা (Valley)ঃ দুটি উন্নত ভূমির মধ্যস্থিত নিম্নভূমিকে উপত্যকা বলে। উপত্যকার সমোন্নতি রেখা উন্নত ভূমির দিকে বেঁকে যায় এবং এর মধ্যে প্রায়ই নদী দেখা যায়। পার্বত্য অঞ্চলে উপত্যকা সংকীর্ণ এবং "V" আকৃতির হয়। অন্যদিকে সমভূমি অঞ্চলের নদী উপত্যকা "U" আকৃতির হয়ে থাকে।

V-আকৃতির উপত্যকা (V-Shaped Valley)ঃ উপত্যকার পাশের দিকের ঢাল বেশি খাঁড়া ও নিচের ভূভাগ সংকীর্ণ হলে এরূপ উপত্যকা V-এর মত দেখায়। এতে ঢাল সাধারণত উত্তল বা সুষম হয়। ফলে যে স্থানে সমোন্নতি রেখার মান কম সেখানে ঐ রেখাগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট ও উপত্যকা গায়ে দূরে দূরে বিন্যস্ত হয়। পাহাড়ী নদীর উপত্যকায় সমোন্নতি রেখাগুলোর পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান বেশি থাকে সেজন্য নির্দিষ্ট রেখা বরাবর প্রস্থচ্ছেদ অংকন করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, ভূমি বেশ ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে গেছে।

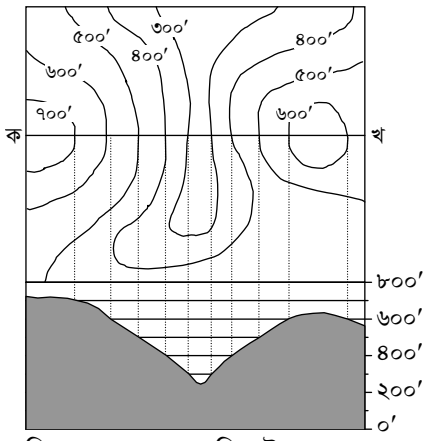

চিত্র ৪.৩.৯ **V**-আকৃতির উপত্যকা

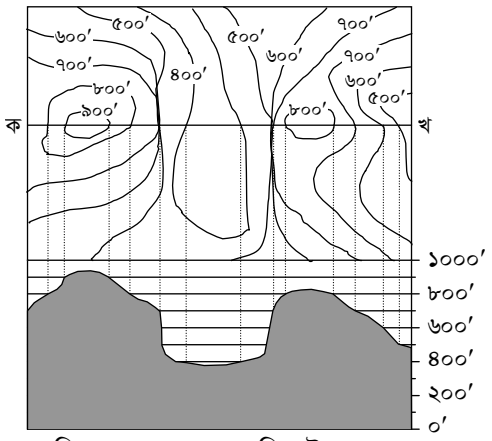

চিত্র ৪.৩.১০ **U**-আকৃতির উপত্যকা

U-আকৃতির উপত্যকা (U-Shaped Valley)ঃ হিমবাহ প্রভাবিত অঞ্চলে উপত্যকার সমোন্নতি রেখার উপর প্রস্থচ্ছেদ অংকন করলে উপত্যকার আকৃতি ইংরেজি অক্ষর U-এর মত দেখায়। কাছাকাছি বিন্যস্ত দুই প্রস্থ সমোন্নতি রেখার মধ্যে উপত্যকা তল বেশ প্রশস্ত থাকে, আবার উপত্যকার ঢাল ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ক্রমশ উপরের দিকে ঢাল যত বৃদ্ধি পায় সমোন্নতি রেখাগুলোও ততই ঘন সন্নিবিষ্ট হয়। এ ছাড়াও সমভূমি অঞ্চলে নদীর পার্শ্বক্ষয় বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে U আকৃতির উপত্যকা গঠন করতে পারে।

জলপ্রপাত (Waterfall)ঃ পার্বত্য অঞ্চলে ভূমি খুব খাঁড়া হওয়ায় সমোন্নতি রেখাগুলো খুব ঘন ঘন সন্নিবেশিত হয়। অনেক সময় নদী দ্বারা ভূমি ক্ষয়ের ফলে এরূপ ভূভাগ এত খাঁড়া হয় যে, এর সমোন্নতি রেখাগুলো একটির সাথে অপরটি মিলে যায়। ফলে এরূপ স্থানে নদীর পানি বহু নিচে পতিত হয়ে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। তবে খুব খাঁড়া ঢালের উপর দিয়ে ধাপে ধাপে অগ্রসরমান প্রবল নদীস্রোত খরস্রোত (Rapid) গঠন করে।

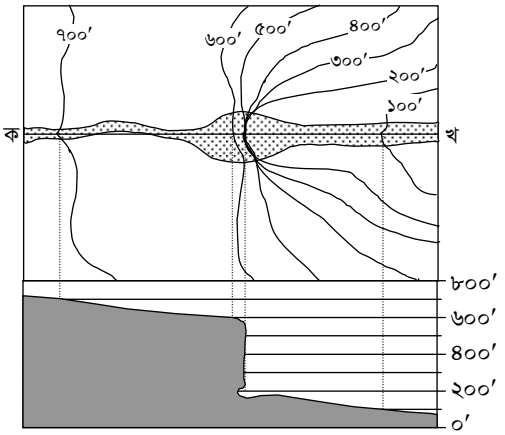

চিত্র ৪.৩.১১ জলপ্রপাত

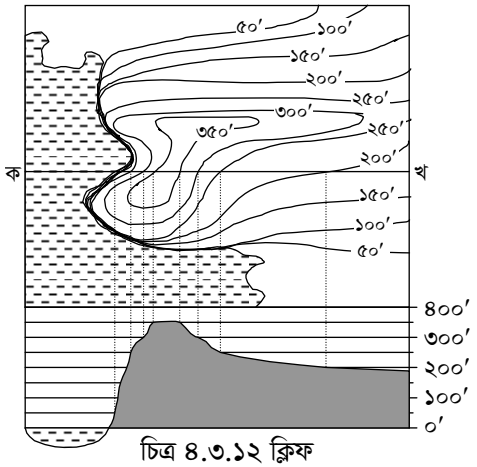

চিত্র ৪.৩.১২ ক্লিফ

ক্লিফ বা খাঁড়া পাড় (Cliff)ঃ প্রস্তরময় সমুদ্র উপকূলে এই ধরনের ভূমিরূপ দেখা যায়। এ ধরনের উচু ভূমি সমুদ্রের দিকে ক্রমশঃ ঢালু না হয়ে হঠাৎ করে খাঁড়া ভাবে সমুদ্রের সাথে মিলিত হয়। বিভিন্ন উচ্চতার সমোন্নতি রেখাসমূহ সমুদ্রের তীরে এসে একত্রে মিলিত হয় বা ঘন সন্নিবেশিত ভাবে অবস্থান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সমোন্নতি রেখা ও বর্ণনাসহ একটি শাঙ্কব পাহাড়ের পার্শ্বচিত্র অংকন করুন।
২. সমোন্নতি রেখা ও বর্ণনাসহ একটি আগ্নেয়গিরির পার্শ্বচিত্র অংকন করুন ।
৩. সমোন্নতি রেখা ও বর্ণনাসহ একটি দুই শৃঙ্গ বিশিষ্ট পাহাড়ের পার্শ্বচিত্র অংকন করুন ।
৪. সমোন্নতি রেখা ও বর্ণনাসহ একটি মালভূমির পার্শ্বচিত্র অংকন করুন ।
৫. সমোন্নতি রেখা ও বর্ণনাসহ একটি প্রণবভূমির পার্শ্বচিত্র অংকন করুন ।
৬. সমোন্নতি রেখা ও বর্ণনাসহ একটি শৈলশিরার পার্শ্বচিত্র অংকন করুন ।
৭. সমোন্নতি রেখা ও বর্ণনাসহ একটি নলের পার্শ্বচিত্র অংকন করুন ।
৮. সমোন্নতি রেখা ও বর্ণনাসহ একটি স্পার এর পাহাড়ের পার্শ্বচিত্র অংকন করুন ।
৯. সমোন্নতি রেখা ও বর্ণনাসহ একটি "V" আকৃতির উপত্যকার পার্শ্বচিত্র অংকন করুন ।
১০. সমোন্নতি রেখা ও বর্ণনাসহ একটি "U" আকৃতির উপত্যকার পার্শ্বচিত্র অংকন করুন ।
১১. সমোন্নতি রেখা ও বর্ণনাসহ একটি জলপ্রপাতের পার্শ্বচিত্র অংকন করুন ।
১২. সমোন্নতি রেখা ও বর্ণনাসহ একটি ক্লিফ এর পার্শ্বচিত্র অংকন করুন।

পাঠ-৪.৪ ঢাল ও নতিমাত্রা

এই পাঠ শেষে আপনি-

- **ঢাল ও তার প্রকারভেদ সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং**
- **ঢাল পরিমাপের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবেন।**

ঢাল ও নতিমাত্রা

কোন তলের ক্রম উন্নতি বা অবনতিকে ঢাল বলে। অর্থাৎ পৃথিবীর বন্ধুর উপরিভাগের বিভিন্ন ভূমিরূপের উচ্চতার তারতম্যের হার বা পরিমানকে ঢাল বা নতি (Slope) বলা যায়। ভূপৃষ্ঠের ঢালের পরিমানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভূমিরূপকে চিহ্নিত করা হয়। শূণ্য বা প্রায় শূণ্য ঢালের ভূপৃষ্ঠকে বলা হয় সমতলভূমি আবার পাহাড়ী এলাকায় বিভিন্ন প্রকার এবং মাত্রার ঢালের সমন্নয়ে উচ্চভূমি লক্ষ্য করা যায়। কোন ভূভাগের ঢালের পরিমানকে নতিমাত্রা (Gradient) বলে। ঢালের আনুভূমিক পরিমাপ অনুসারে ভূভাগের উলম্ব উন্নতির পরিমান হিসাব করে নতিমাত্রা পরিমাপ করা হয়।

ঢালের গুরুত্ব (Importance of Slope)ঃ ভূমি বন্ধুরতা সম্পর্কে ধারণা অর্জন এবং ভূমিরূপের পার্শ্বচিত্র অংকনের জন্য ঢাল এবং ঢালের পরিমাপ পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারনা থাকা প্রয়োজন। এছাড়াও প্রাকৃতিক ও মানবিক ক্ষেত্রে ভূমির ঢালগুলো উলে- খযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ঢালের বিকাশের মাধ্যমে পানি নিষ্কাশনের ধরন নির্ধারিত হয় এবং ভূমিরূপের পরিবতন সাধিত হয়। ঢালের প্রকৃতি ভূভাগের উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। মানুষের কৃষি কর্মকান্ড এবং ভূমি ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই ঢালের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়। সেচের কাজে ব্যবহৃত খালগুলো ঢালের দিক অনুসারে খনন করা হয়। এছাড়াও ঢালের নতিমাত্রা এবং প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে বসতির ধরন এবং পরিবহণ নেটওয়ার্ক নির্ধারিত হয়ে থাকে।

ঢালের শ্রেণী (Types of Slopes)

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ভূমিরূপে বিকাশ প্রাপ্ত ঢালগুলিকে এদের প্রকৃতি অনুসারে প্রধানত চারভাগে বিভক্ত করা হয়।

(ক) সুষম ঢাল (Uniform Slope) ঃ সমোন্নতি রেখাগুলো যদি সমদূরে বিন্যস্ত হয় অর্থাৎ রেখাগুলোর মধ্যবর্তী ফাঁক প্রায় সমান হয়, তা হলে নির্দিষ্ট রেখা বরাবর প্রস্থচ্ছেদ অংকন করলে এর আকৃতি প্রায় সমান হারে হ্রাস বা বৃদ্ধি পায়; কোথাও বেশি বা কম হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে ঐ রেখা বরাবর ভূমির উপরিভাগের ঢাল প্রস্থচ্ছেদ অংশের সর্বত্র প্রায় সমান থাকে (চিত্র ৪.৪.১)।

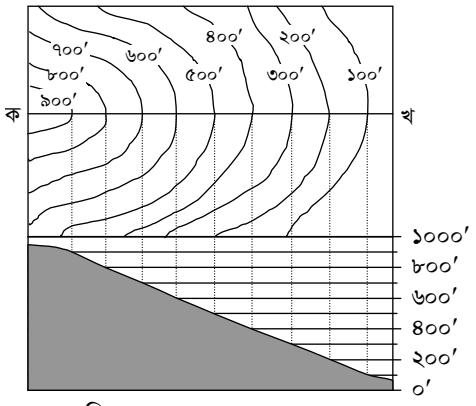

চিত্র ৪.৪.১ সুষম ঢাল

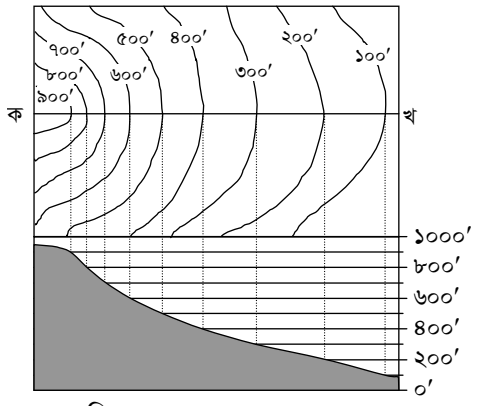

চিত্র ৪.৪.২ অবতল ঢাল

(খ) অবতল ঢাল (Concave Slope) ঃ যদি কোন ভূভাগে উঁচু থেকে নিচের দিকে নামার সময় ঢালটি ক্রমশ ভিতরের দিকে বেঁকে যাচ্ছে বলে মনে হয় তা হলে এটি অবতল ঢাল নির্দেশ করে। এ ঢাল নির্দেশক সমোন্নতি রেখাগুলো উচ্চ পর্যায়ে ঘন ও নিচের দিকে ক্রমশ দূরে সরে যায়। অর্থাৎ সমোন্নতি রেখার মান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হ্রাস পায় এবং যতই সমুদ্র সমতলের দিকে আসতে থাকে, সমোন্নতি রেখার অনুভূমিক দূরত্ব তত বৃদ্ধি পায় (চিত্র ৪.৪.২)।

(গ) উত্তল ঢাল (Convex Slope)ঃ কোন ভূভাগের উপরের দিক স্ফীত অর্থাৎ, ঢালের পরিমাণ উচ্চ সমোন্নতি রেখায় কম, কিন্তু নিম্ন সমোন্নতি রেখায় বেশি হলে তাকে উত্তল ঢাল বলে (চিত্র ৪.৪.৩)। যে কোন গোলকের বাইরের দিক উত্তল ঢাল বিশিষ্ট। যদি সমোন্নতি রেখার মান বৃদ্ধির সংঙ্গে সংঙ্গে এদের পারস্পরিক দূরত্বও বৃদ্ধি পায়, তা হলে সেই সমোন্নতি রেখা উত্তল ঢাল নির্দেশ করে।

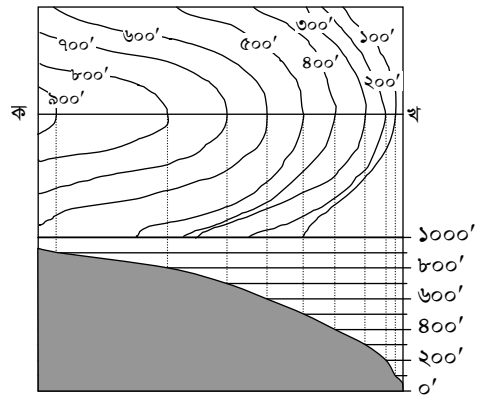

চিত্র ৪.৪.৩ উত্তল ঢাল

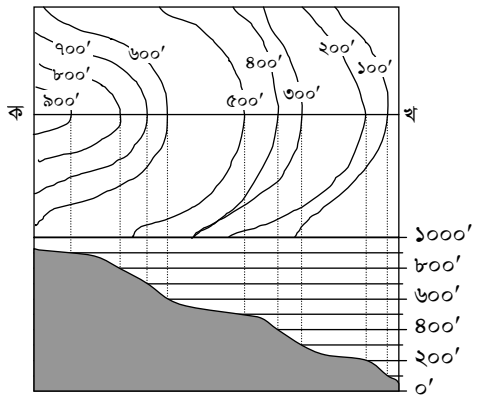

চিত্র ৪.৪.৪ তরঙ্গায়িত ঢাল

(ঘ) তরঙ্গায়িত ঢাল (Undulating Slope)ঃ যখন নির্দিষ্ট ভূভাগের কোন অংশ উত্তল, আবার কোন অংশ অবতল এবং ভূপৃষ্ঠ উঁচু নিচু ভাবে সন্নিবেশিত হয়, তখন সেই ভূভাগের ঢালকে তরঙ্গায়িত ঢাল বলে (চিত্র ৪.৪.৪)। এরূপ ক্ষেত্রে একটি উত্তল ঢালের পর একটি অবতল ঢাল দেখতে পাওয়া যায়। তরঙ্গায়িত ঢালের ক্ষেত্রে পরস্পর সন্নিহিত সমোন্নতি রেখার অনুভূমিক দূরত্ব কোথাও কম আবার কোথাও বেশী।

নতিমাত্রা

অনেক সময় কোন ভূভাগের ঢালের পরিমাণ পরিমাপের প্রয়োজন হয়; সে সময় ঢালটি 'যথেষ্ট খাড়াই' বা 'স্বাভাবিক' প্রভৃতি গুণবাচক পরিমাপে প্রকাশ করলে তার মাধ্যমে ব্যবহারিক কাজ করা যায় না। পরিবহণ ও প্রকৌশলগত সমস্যাবলী সমাধানের জন্য ঢাল খাড়াই-এর পরিমাণ সঠিকভাবে পরিমাপ করা প্রয়োজন। **কোন ঢালের আনুভূমিক পরিমাপ (Horizontal Equivalent) অনুসারে ভূভাগের উলম্ব উত্থানের পরিমাণকে (Vertical Interval) নতিমাত্রা (Gradient) বলে;** অর্থাৎ ঢালের খাড়া-এর পরিমাপকে নতিমাত্রা বা নতির পরিমাণ বলে। সূত্রের মাধ্যমে বলা যায়-

$$\text{নতিমাত্রা} = \frac{\text{উলম্ব ব্যবধান (V.I.)}}{\text{আনুভূমিক পরিমাপ (H.E)}}$$

ঢালের পরিমান প্রকাশের পদ্ধতি

ঢালের পরিমাণ প্রকাশের জন্য কয়েকটি ভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে; যদিও প্রতিটি পদ্ধতির মূলনীতি হচ্ছে নতিমাত্রা। ধরা যাক, কোন ভূপৃষ্ঠে A এবং B বিন্দুর মধ্যবর্তী ঢাল নির্ণয় করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে একটি সমকোণী ত্রিভূজের অতিভূজ হিসেবে AB কে কল্পনা করে উক্ত ত্রিভূজের ভূমিকে আনুভূমিক পরিমাপ (H.E) এবং লম্বকে উলম্ব ব্যবধান (V.I.) ধরে ঢাল নির্ণয় করতে হবে (চিত্র ৪.৪.৫)। B বিন্দু হতে একটি আনুভূমিক রেখা টানলে তা A বিন্দু হতে অংকিত লম্বের সাথে C বিন্দুতে মিলিত হবে। এখন ABC সমকোণী ত্রিভূজে অতিভূজ AB হচ্ছে ভূমির ঢাল, BC হচ্ছে ঢাল বাহুর আনুভূমিক দূরত্ব, বা *আনুভূমিক পরিমাপ (H.E)* এবং AC হচ্ছে ঢালবাহুর উলম্ব উত্থান বা *উলম্ব ব্যবধান (V.I.)* । BC এবং AC এর মান জানা থাকলে সহজেই AB রেখার ঢাল নির্ণয় করা যাবে। সাধারণত মানচিত্রের স্কেল হতে BC এর মান এবং সমোন্নতি রেখা

হতে AC এর মান নিয়ে নতিমাত্রা নির্ণয়ের সূত্র অনুসারে ঢালের পরিমান নির্ণয় করা হয়। গাণিতিক পদ্ধতিতে ঢালের পরিমানকে **ডিগ্রি, নতিমাত্রা, শতকরা হার ও মিল** হিসাবে প্রকাশ করা হয়। নীচে এই পদ্ধতিগুলো আলোচনা করা হলো।

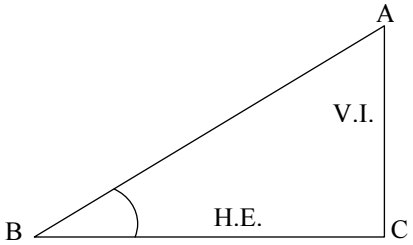

চিত্র ৪.৪.৫ ঢালের পরিমান নির্ণয়

(ক) ডিগ্রির মাধ্যমে (By Degrees)ঃ সমকোণী ত্রিভূজের ত্রিকোনমিতিক হিসাবের মাধ্যমে ঢালের পরিমান ডিগ্রীতে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়; ABC সমকোণী ত্রিভূজের অতিভূজ AB হচ্ছে ঢাল, ভূমি BC হচ্ছে আনুভূমিক দূরত্ব (H.E.) এবং লম্ব AC উলম্ব ব্যবধান (V.I.)। এ ত্রিভূজের ∠ABC ডিগ্রি অনুসারে ঢালের মাত্রা প্রকাশ করছে এবং এটি চাঁদার সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। ত্রিকোণমিতিক হিসাব অনুসারেও এটি নির্ধারণ করা যায়। যেমন, যদি ∠ABC কোনটি θ হয় তা হলে—

$$\theta \text{ এর ট্যানজেন্ট (বা } \tan \angle ABC) = \frac{\text{V.I.}}{\text{H.E.}} = \frac{AC}{BC}$$

ধরা যাক, V.I. = ১০′ এবং H.E. = ২৫′।

$$\text{সুতরাং } \tan\theta = \frac{১০}{২৫} = \frac{২}{৫} = ০.৪।$$

$$\text{বা, } \theta = \frac{১}{\tan}(০.৪)$$

ত্রিকোণমিতিক সারণিতে বিপরীত tan এর এই মান ২১° ৪৪′ ৫″। সুতরাং θ বা ∠ABC এর মান ২১° ৪৪′ ৫″। অর্থাৎ, AB রেখার ঢালের পরিমান ২১ ডিগ্রী ৪৪ মিনিট ৫ সেকেন্ড।

(খ) নতিমাত্রার মাধ্যমে (By Gradient)ঃ ঢালের পরিমানকে ভগ্নাংশ বা অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হলে তাকে নতিমাত্রা বলে। এই ভগ্নাংশ বা অনুপাতের লব রাশি ১ ধরা হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি *উলম্ব ব্যবধান (V.I.)* ও *আনুভূমিক পরিমাপ (H.E.)* এর মধ্যে একটি অনুপাত। সুতরাং এটি একটি ত্রিকোণমিতিক ট্যানজেন্ট। পূর্বের উদাহরণ অনুযায়ী V.I. = ১০ ফুট এবং H.E.= ২৫ ফুট থেকে নতিমাত্রা হবে $\frac{১০}{২৫} = \frac{১}{২.৫}$ অথবা, ১ ঃ ২.৫। এরূপ অনুপাত সংখ্যা দ্বারা বোঝা যায় যে, ভূমির ১ ফুট উত্থান আনুভূমিক দূরত্ব ২.৫ ফুটের সমান। নতিমাত্রায় কোন একক ব্যবহৃত হয়না। ফলে এটিকে যে কোন এককে রূপান্তর করা যায়। উপরের ১ ঃ ২.৫ অনুপাতটিকে ২.৫ গজ আনুভূমিক দূরত্বে ১ গজ উত্থান হিসাবেও প্রকাশ করা যায়।

(গ) শতকরা হারের মাধ্যমে (By per-cent) ঃ নতিমাত্রাকে ১০০ দ্বারা গুণ করলে শতকরা হিসাবে ঢালের পরিমাণ পাওয়া যায়। এর সূত্র হচ্ছে,

$$\text{ঢালের শতকরা হার} = \frac{\text{উলম্ব ব্যবধান (V.I.)}}{\text{আনুভূমিক পরিমাপ (H.E)}} \times ১০০$$

সুতরাং কোন ঢালের নতিমাত্রার পরিমাণ $\frac{১}{২.৫}$ হলে শতকরা হিসাবে উক্ত ঢালের পরিমাণ হবে $\frac{১}{২.৫} \times ১০০ = ৪০\%$।

(ঘ) মিল এর মাধ্যমে (By Mills) ঃ নতিমাত্রাকে ১০০০ দ্বারা গুণ করে ঢালের পরিমাণ মিলে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ,

$$\text{মিলে ঢালের পরিমান} = \frac{\text{উলম্ব ব্যবধান (V.I.)}}{\text{আনুভূমিক পরিমাপ (H.E)}} \times ১০০০$$

সুতরাং কোন ঢালের নতিমাত্রার পরিমাণ $\frac{১}{২.৫}$ হলে মিলে উক্ত ঢালের পরিমাণ হবে $\frac{১}{২.৫} \times ১০০০ = ৪০০$ মিল।

পদাতিক বাহিনীতে ভূমির ঢাল প্রকাশ করার জন্য এই বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

ঢালের তুলনা

দুইটি ঢালের নতিমাত্রা পর্যবেক্ষণ করে এদের মধ্যে তুলনা করা যায়। এর নিয়ম খুবই সহজ। নতিমাত্রার হার যত বড় হবে ঢাল তত কম হবে। চিত্র ৪.৪.৬ অনুযায়ী AC এর নতিমাত্রা ১/৬ এবং DC-এর নতিমাত্রা ১/২ ; চিত্র থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে DC ঢালটি AC ঢাল এর চেয়ে বেশি খাঁড়া।

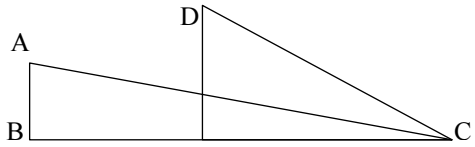

চিত্র ৪.৪.৬ দু'টি ঢালের তুলনা

ঢালের নতিমাত্রা এবং ঢালের কোণের পরিমানের মধ্যে পারস্পরিক পরিবর্তন

ঢালের বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যম থাকায় একই ঢালকে ভিন্ন ভিন্ন এককে প্রকাশ করা যায়। যেমন একটি ঢালের নতিমাত্রা ১/২৮.৬ আবার একে কোনের মাধ্যমে প্রকাশ করলে তা হবে ২°। সুতরাং ব্যবহারিক সুবিধার জন্য একজন মানচিত্র বিশে-ষককে নতিমাত্রাকে ঢালের কোনে এবং ঢালের কোনকে নতিমাত্রায় পরিবর্তন করতে হয়। এই পদ্ধতি নীচে আলোচনা করা হল।

নতিমাত্রাকে ঢালের কোনে রূপান্তর

নতিমাত্রা হতে ঢালের কোন নির্ণয় করার জন্য তিনটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এগুলো হচ্ছে-

(ক) নতিমাত্রা অনুসারে উলম্ব ব্যবধান (V.I) এবং অনুভূমিক পরিমাপ (H.E.) এর দৈর্ঘ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্কেলে একটি সমকোণী ত্রিভুজ অংকন করতে হবে এবং চাঁদার সাহায্যে ঢালের কোণ পরিমাপ করে ডিগ্রীতে প্রকাশ করতে হবে।

(খ) ত্রিকোণমিতিক হিসাব অনুসারে $\tan\theta$ (ঢালের কোণ) = $\frac{\text{V.I.}}{\text{H.E.}}$ সুতরাং এ হিসাবের মাধ্যমে প্রাপ্ত নতিমাত্রার ভগ্নাংশকে দশমিক ভগ্নাংশে পরিবর্তন করে লগ তালিকার স্বাভাবিক ট্যানজেন্ট সারণি থেকে সহজেই কোণের পরিমাণ জানা যায়।

(গ) আমরা জানি স্বাভাবিক কোট্যানজেন্ট সারণি অনুসারে ১° এর মান ৫৭.৩। এই মান ব্যবহার করে ১/৬ অপেক্ষা কম নতিমাত্রার কোণ নির্ধারণের জন্য উক্ত নতিমাত্রাকে ৫৭.৩ দ্বারা গুণ করতে হয়। কোন নতিমাত্রা ১/২৮.৬ হলে ঢালের কোণ হবে $\frac{১}{২৮.৬} \times ৫৭.৩ = ২$ ডিগ্রি।

ঢালের কোণকে নতিমাত্রায় পরিবর্তন

ঢালের কোণকে নতিমাত্রায় পরিবর্তন করার জন্য তিনটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এগুলো হচ্ছে-

(ক) ঢালের কোণকে ৫৭.৩ দ্বারা ভাগ করলে ভগ্নাংশ আকারে নতিমাত্রা পাওয়া যায়। যেমন, কোন ঢালের পরিমাণ ৫° হলে নতিমাত্রা হবে $\frac{৫}{৫৭.৩} = \frac{১}{১১.৪}$ ।

(খ) ঢালের কোণ ও আনুভূমিক পরিমাপ (H.E.) জানা থাকলে এদের সাহায্যে একটি সমকোণী ত্রিভূজ অংকন করে উলম্ব ব্যবধান (V.I.) নির্ধারণ করতে হবে। অতঃপর $\frac{\text{V.I.}}{\text{H.E.}}$ সূত্র অবলম্বন করলে নতিমাত্রা পাওয়া যাবে।

(গ) ত্রিকোণমিতিক হিসাব অনুসারে দেয় ঢালের কোণের ট্যানজেন্টের মান গাণিতিক সারণি থেকে নির্ণয় করলে তা ভগ্নাংশ আকারে পাওয়া যাবে। এটিই হবে কাঙ্খিত নতিমাত্রা।

সমোন্নতি রেখার মানচিত্র থেকে ঢাল নির্ধারণ

সমোন্নতি রেখাযুক্ত মানচিত্রে ভূমির ঢাল নির্ণয়েরর জন্য দু'টি সমোন্নতিরেখার মধ্যবর্তী আনুভূমিক দূরত্ব জানা প্রয়োজন। মানচিত্রের এই দূরত্ব ডিভাইডার বা কাঁটা কম্পাসের মাধ্যমে পরিমাপ করে মানচিত্রের স্কেল অনুযায়ী যে প্রকৃত আনুভূমিক

দূরত্ব পাওয়া যায় তা হচ্ছে নতিমাত্রা নির্ণয়ের সূত্রের আনুভূমিক পরিমাপ (H.E.)। সমোন্নতি রেখাদ্বয়ের উচ্চতার পার্থক্য হতে উলম্ব ব্যবধান (V.I.) পাওয়া যাবে। অতঃপর $\frac{\text{V.I.}}{\text{H.E.}}$ সূত্র অবলম্বন করলে নতিমাত্রা পাওয়া যাবে।

মনে করি মানচিত্র থেকে A এবং B অবস্থান দু'টির মধ্যবর্তী ঢালের পরিমাণ জানতে হবে [চিত্র ৪.৪.৭(ক)]। প্রথমে A এবং B অবস্থান দু'টির মধ্যবর্তী আনুভূমিক মানচিত্রের দূরত্ব নির্ণয় করে মানচিত্রের স্কেলের মাধ্যমে প্রকৃত দূরত্ব বা আনুভূমিক পরিমাপ (H.E.) নির্ণয় করতে হবে। ধরা যাক এই দূরত্ব ১৫০০ ফুট। A এবং B উভয়েই সরাসরি সমোন্নতি রেখার উপরে অবস্থিত হওয়ায় A অবস্থানের উচ্চতা হবে ১০০ ফুট এবং B অবস্থানের উচ্চতা হবে ২৫০ ফুট। সুতরাং অবস্থানদ্বয়ের উলম্ব ব্যবধান (V.I.) হবে ২৫০ - ১০০ = ১৫০ ফুট। অতএব, ঢালের পরিমান হবে, $\frac{১৫০}{১৫০০} = \frac{১}{১০}$ বা, ১০% কিংবা ১০০ মিল অথবা ৫° ৪২′ ৫৭″।

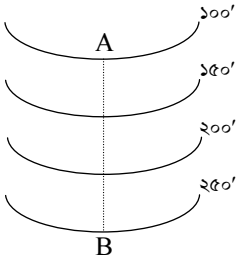

চিত্র ৪.৪.৭ (ক)

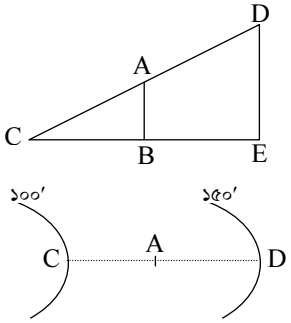

চিত্র ৪.৪.৭ (খ)

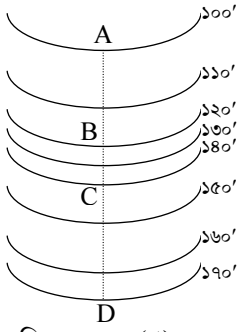

চিত্র ৪.৪.৭ (গ)

ঢাল নির্ণয়ের অবস্থান বা অবস্থানসমূহ যদি দু'টি সমোন্নতি রেখার মধ্যবর্তী স্থানে থাকে তাহলে *সমোন্নতি রেখা সন্নিবেশ* (Interpolation of contours) পদ্ধতির মাধ্যমে মধ্যবর্তী অবস্থানের উলম্ব ব্যবধান (V.I.) নির্ণয় করা হয়। চিত্র ৪.৪.৭(খ) অনুযায়ী A বিন্দু ১০০′ ও ১৫০′ সমোন্নতি রেখাদ্বয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে রয়েছে। অর্থাৎ সমোন্নতি রেখা দু'টির মধ্যে বিরতির পরিমান ১৫০ - ১০০ = ৫০ ফুট। দেখা যাচ্ছে $\frac{\text{CA}}{\text{CD}} = \frac{১}{২}$ (প্রায়)। সুতরাং A অবস্থানের উচ্চতা হবে,

$$১০০ + \frac{১}{২} \times \text{সমোন্নতি রেখার বিরতি} = ১০০ + \frac{১}{২} \times ৫০$$
$$= ১২৫ \text{ ফুট}।$$

এখন CA এর আনুভূমিক দূরত্ব পরিমাপ করে সহজেই ঢাল নির্ণয় করা যাবে।

যৌগিক বা তরঙ্গায়িত ঢালের ক্ষেত্রে সমোন্নতি রেখা হতে ঢালের পরিমান নির্ণয় করার জন্য অবস্থানগুলোকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে আলাদা আলাদাভাবে ঢাল নির্ণয় করতে হয়। চিত্র ৪.৪.৭(গ) নং চিত্র হতে দেখা যায় যে, B হতে C এর ঢাল A হতে B এর ঢালের চেয়ে বেশী খাঁড়া। সুতরাং সরাসরি A হতে C এর ঢাল নির্ণয় করলে তা AC এর মধ্যবর্তী ভূমিরূপকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করবে না।

পাঠসংক্ষেপ

কোন তলের ক্রম উন্নতি বা অবনতিকে ঢাল বলে। কোন ভূভাগের ঢালের পরিমানকে নতিমাত্রা বলে। ঢালকে প্রধানত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়; এগুলো হচ্ছে- সুষম ঢাল, অবতল ঢাল, উত্তল ঢাল এবং তরঙ্গায়িত ঢাল। কোন ঢালের উলম্ব উত্থানের পরিমাণকে (Vertical Interval) আনুভূমিক পরিমাপ (Horizontal Equivalent) দিয়ে ভাগ করে ঢালের পরিমান নির্ণয় করা হয়। গাণিতিক পদ্ধতিতে ঢালের পরিমানকে চারটি উপায়ে প্রকাশ করা হয় এগুলো হচ্ছে ডিগ্রি, নতিমাত্রা, শতকরা হার ও মিল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন

১.১. ভূপৃষ্ঠের ঢালের পরিমানের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ভূমিরূপকে ..... করা হয়।

১.২. ঢালের আনুভূমিক পরিমাপ অনুসারে ভূভাগের ..... পরিমান হিসাব করে নতিমাত্রা পরিমাপ করা হয়।

১.৩. যে কোন ..... বাইরের দিক উত্তল ঢাল বিশিষ্ট।

১.৪. সমকোণী ত্রিভূজের ..... হিসাবের মাধ্যমে ঢালের পরিমান ডিগ্রীতে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

১.৫. নতিমাত্রাকে ..... দ্বারা গুণ করে ঢালের পরিমাণ মিলে প্রকাশ করা হয়।

২. সত্য হলে 'স' মিথ্যা হলে 'মি' লিখুন

২.১. শূণ্য বা প্রায় শূণ্য ঢালের ভূপৃষ্ঠকে বলা হয় সমতলভূমি।

২.২. ঢালের প্রকৃতি ভূভাগের উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

২.৩. উত্তল ঢাল নির্দেশক সমোন্নতি রেখাগুলো উচ্চ পর্যায়ে ঘন ও নিচের দিকে ক্রমশ দূরে সরে যায়।

২.৪. অবতল ঢালের ক্ষেত্রে পরস্পর সন্নিহিত সমোন্নতি রেখার অনুভূমিক দূরত্ব কোথাও কম আবার কোথাও বেশী।

২.৫. নতিমাত্রার হর রাশি যত বড় হবে ঢাল তত কম হবে।

৩. সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন

৩.১. নীচের কোনটি ঢালের সাথে সংস্পৃক্ত নয় ?

(ক) কৃষিকাজ (খ) সেচ ও পানি নিষ্কাশন

(গ) বসতির ধরন (ঘ) সবগুলোই সঠিক

৩.২. কোন ঢালের ক্ষেত্রে সমোন্নতি রেখাগুলো উচ্চ পর্যায়ে ঘন ও নিচের দিকে ক্রমশ দূরে সরে যায় ?

(ক) সুষম ঢাল (খ) অবতল ঢাল

(গ) উত্তল ঢাল (ঘ) তরঙ্গায়িত ঢাল

৩.৩. পদাতিক বাহিনীতে ঢালকে কোন এককে প্রকাশ করা হয় ?

(ক) ডিগ্রী (খ) শতকরা হার

(গ) মিল (ঘ) নতিমাত্রা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ঢাল ও নতিমাত্রা কাকে বলে ? নতিমাত্রা নির্ণয়ের সূত্রটি লিখুন।

২. সমোন্নতি রেখা ও পার্শ্বচিত্রসহ সুষম ঢালের বর্ণনা দিন।

৩. সমোন্নতি রেখা ও পার্শ্বচিত্রসহ উত্তল ঢালের বর্ণনা দিন।

৪. সমোন্নতি রেখা ও পার্শ্বচিত্রসহ সুষম ঢালের বর্ণনা দিন।

৫. সমোন্নতি রেখা ও পার্শ্বচিত্রসহ সুষম ঢালের বর্ণনা দিন।

৬. নতিমাত্রা হতে ঢালের কোন নির্ণয়ের পদ্ধতি লিখুন।

৭. ঢালের কোন কে নতিমাত্রায় রূপান্তরের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ঢাল কি? উদাহরণসহ ঢালের শ্রেণীবিভাগ আলোচনা করুন।

২. ঢাল কিভাবে পরিমাপ করা হয় ? ঢালের পরিমান প্রকাশের পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন।

উত্তরমালাঃ ইউনিট-৪

পাঠ-৪.১

১.১. উচ্চতা, **১.২.** বৃহৎ স্কেল, **১.৩.** ঢাল, **১.৪.** গাঢ় নীল, **১.৫.** উচ্চতার ।

২.১. মি, **২.২.** মি, **২.৩.** স, **২.৪.** স, **২.৫.** স

৩.১. (ঘ), **৩.২.** (খ), **৩.৩.** (ক)

পাঠ-৪.২

১.১ প্রস্থচ্ছেদ, **১.২.** বন্ধুরতার, **১.৩.** স্কেলের, **১.৪.** ২০, **১.৫.** একাধিক ।

২.১. মি, **২.২.** স, **২.৩.** মি, **২.৪.** মি, **২.৫.** স

৩.১. (ক), **৩.২.** (খ), **৩.৩.** (ঘ)

পাঠ-৪.৪

১.১ চিহ্নিত, **১.২.** উলম্ব উন্নতির, **১.৩.** গোলকের, **১.৪.** ত্রিকোনমিতিক, **১.৫.** ১০০০।

২.১. স, **২.২.** স, **২.৩.** মি, **২.৪.** মি, **২.৫.** স

৩.১. (ঘ), **৩.২.** (গ), **৩.৩.** (গ)